চাঁদমামা
মার্চ ১৯৭৩
৭০ P
http://jhargramdevil.blogspot.com

Photo by RAM KRISHNA SHARMA

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতওঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

Statement about ownership of CHANDAMAMA (Bengali)
Rule 8 (Form IV), Newspapers (Central) Rules, 1956

1.	*Place of Publication*	:	'CHANDAMAMA BUILDINGS' 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26
2.	*Periodicity of Publication*	:	MONTHLY 1st of each calendar month
3.	*Printer's Name*	:	B. V. REDDI
	Nationality	:	INDIAN
	Address	:	Prasad Process Private Ltd., 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26
4.	*Publisher's Name*	:	B. VISWANATHA REDDI
	Nationality	:	INDIAN
	Address	:	Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26
5.	*Editor's Name*	:	CHAKRAPANI (A. V. Subba Rao)
	Nationality	:	INDIAN
	Address	:	'Chandamama Buildings' 2 & 3, Arcot Road, Vadapalani, Madras-26
6.	*Name & Address of individuals who own the paper*	:	Chandamama Publications PARTNERS: 1. Sri B. Nagi Reddi, 2. Smt. B. Padmavathi, 3. Smt. B. Bharathi, 4. Sri B. V. Sanjaya Reddi (Minor), 5. Sri B. N. Suresh Reddi ("), 6. Sri B. V. Satish Reddi („).

I, B. Viswanatha Reddi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

B. VISWANATHA REDDI
Signature of the Publisher

1*st March* 1973

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

জয় পরাজয় নিয়ে সারা বিশ্বে এত কাণ্ড। কিন্তু বিরোধের মধ্যেও কত যে ঐক্য রয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে এ সংখ্যার বেতাল কথায়। এই সংখ্যা থেকে 'কাঠের ঘোড়া' নামে আরবের এক লোককথা প্রকাশিত হচ্ছে। 'অহংকারে' প্রকাশ পেয়েছে কী ভাবে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করা যায়।

এ ছাড়া আছে অগ্নিপরীক্ষা, অচ্ছুত, কিপটে বুড়ি, গোঁফের দাম, উপায়, যাচাই প্রভৃতি। আর আছে যক্ষপর্বত, মহাভারত ও শিবলীলা।

খণ্ড ১ মার্চ ১৯৭৩ সংখ্যা ৯

ঘৃতেন বর্দ্ধতে বুদ্ধিঃ,
ক্ষীরে নায়ুষ্য বর্দ্ধনম্,
শাকেন বর্দ্ধতে ব্যাধিঃ,
মাংসম্ মাংসেন বর্দ্ধতে। ॥ ১ ॥

[ঘি বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়, দুধ আয়ু বৃদ্ধি করে, শাক ব্যাধি বৃদ্ধি করে আর মাংস বৃদ্ধি করে শুধু মাংস।]

অনভ্যাসে বিষম্ শাস্ত্রম্,
অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্,
দরিদ্রস্য বিষম্ গোষ্ঠী,
বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্। ॥ ২ ॥

[অভ্যাস বিহীন ব্যক্তির কাছে শাস্ত্রজ্ঞান, বদহজমের রোগীর কাছে ভোজন, দরিদ্রের কাছে মনোরঞ্জন এবং বৃদ্ধের কাছে যুবতী স্ত্রী বিষের সমান।]

বৃথা বৃষ্টি সসমুদ্রেচ,
বৃথা তৃপ্তেচ ভোজনম্,
বৃথা ধনবতৌ দানম্,
দরিদ্রে যৌবনম্ বৃথা। ॥ ৩ ॥

[সমুদ্রে বর্ষণ, ভরা পেটে ভোজন, ধনীকে দান করা এবং দরিদ্রের পক্ষে যৌবন বৃথা।]

উচিত-অনুচিত-বৃথা

অগ্নিপরীক্ষা

পুরন্দর রাজ্যের রাজকুমারী লাবণ্য রূপে অপরূপা। সৌন্দর্যে অপ্সরীরাও হার মানে। রাজা যোগ্য বরের খোঁজ করছিলেন। পুরন্দর দেশটা ছিল অন্যান্য দেশ থেকে অনেক দূরে। ঐ দেশের চার দিকে ভয়ঙ্কর বন ছিল। তাই অন্যান্য দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে অনেক পাহাড় আর অরণ্য পেরিয়ে যেতে হত। সেইটাই লাবণ্যের যোগ্য পাত্র পেতে মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাধা অতিক্রম করা সহজ নয়।

লাবণ্যর বিয়ে করার খুব ইচ্ছে। জীবনটা তার কাছে ক্লান্তিকর লাগছিল। কোন আনন্দ নেই তার জীবনে। দাসীরা যে গল্প শুনিয়ে আনন্দ দিতে চাইত তাকে সে ঐ গল্প বহুবার ওদের কাছেই শুনেছে। যে সব খেলা দেখাত সে খেলাগুলো বহুবার দেখেছে লাবণ্য। এই সব কারণে রাজকুমারী লাবণ্যর সময় যেন আর কিছুতেই ভাল কাটছিল না। মন মেজাজ খারাপ ছিল তার। সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে।

একদিন রাজকুমারী লাবণ্য রাজমহলের কাউকে না জানিয়ে রাজধানীর উত্তর দিকে বনপথ ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে তো হাঁটছেই। আর ভাবছে। অবশেষে সে এক সুন্দর উদ্যানে পৌঁছল। অপূর্ব সুন্দর ফুলের বাহার চারদিকে। ঐ ধরণের ফুলের গাছ আর ফুল লাবণ্য জীবনে কোন দিন দেখেনি। কোন মানুষের হাতে তৈরি উদ্যান বলে মনে হচ্ছিল না। সেটা যেন প্রকৃতির আপন খেয়ালের সৃষ্টি। কোন পাখি নেই, কোন পশু নেই সেই উদ্যানে।

রীণা ভট্টাচার্য

পশুপাখিহীন উদ্যান যে কত ভয়ঙ্কর সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তা ঐ উদ্যান না দেখলে বোঝা যায় না।

লাবণ্য প্রত্যেক ফুলের কাছে গিয়ে দেখে আর শুঁকে অবাক হচ্ছিল। শেষে একটা ফুল তুলে গুঁজে নিল বেণীতে।

"ফুল কে ছিঁড়ছে?" জিজ্ঞেস করতে করতে গাছের আড়াল থেকে এক যুবক লাবণ্যর সামনে এসে দাঁড়াল। লাবণ্যকে দেখেই যুবক তো অবাক। তার মুখে কথা নেই। হাঁ করে সে লাবণ্যর দিকে তাকিয়ে রইল।

"ফুল ছেঁড়া যে বারণ আমি তা জানতাম না। কাউকে তো দেখতে পাইনি যে জিজ্ঞেস করব। আমি ভেবেছিলাম যে এখানে কেউ নেই। লাবণ্য অজানা পরিবেশে অচেনা যুবকের প্রশ্নের জবাবে নির্ভিকভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বলল।

যুবক চাপা হাসি হেসে বলল, "ঠিক তাই। এখানে কেউ থাকে না। আমি একাই এই উদ্যানে পাহারা দিয়ে থাকি।" এই কথা বলে যুবকটি ঐ গাছ থেকেই আরও কয়েকটা ফুল তুলে লাবণ্যর হাতে দিল।

আপনি এক্ষুনি বলছিলেন না, ফুল ছেঁড়া নিষেধ?" লাবণ্য জিজ্ঞেস করল।

"আপনার মত সুন্দরীর ক্ষেত্রে ঐ নিয়ম পালন করার দরকার নেই।" যুবক বলল। কেন বলল, এভাবে বলার উদ্দেশ্য যে কি তা লাবণ্য ঠিক বুঝতে পারল না।

"আপনি কে?" লাবণ্য জিজ্ঞেস করল।

"আমার নাম সুব্রত। আমি এই গন্ধর্ব-উদ্যানের রক্ষক।" সুব্রত জবাবে বলল।

অন্যদের মত লাবণ্যরও গন্ধর্বদের সম্পর্কে ভয় ছিল। গন্ধর্বদের সাথে সম্পর্ক রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় ভাল হয় না। গন্ধর্বরা অনেক রকমের বিদ্যার অধিকারী হয়। লাবণ্য এর আগে জানত না যে গন্ধর্বরা তার দেশের এত কাছেই আছে।

লাবণ্য অস্বস্তি বোধ করছে দেখে সুব্রত বলল, "রাজকুমারী, ভয় পাবেন না। আমি

এখন গন্ধর্বদের সেবক বটে তবে আমিও আগে একজন মানুষই ছিলাম। আমার দাদু পূর্বদিকের সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন। আমার অল্প বয়সে বাবা-মার মৃত্যু হওয়ায় আমার দাদু আমাকে নিজের কাছে রেখে লালন পালন করেছিলেন। বড় হয়ে আমি আমার দাদুর সাথে এখানে শিকার করতে এসেছিলাম। সেই সময় এক গন্ধর্বরাণী আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তার ধারণা ছিল আমি তাকে ভালবাসব। তার সাথে থাকব। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসতে পারিনি। তাই রাণী দিনের বেলায় এই উদ্যান পাহারা দেওয়ার কাজ আমাকে দিয়েছে। রাত হলেই রাণী আমাকে তার কাছে নিয়ে যায়। দিনের পর দিন এই গন্ধর্বদের সাথে আমার ভাল লাগছে না। "আমি আশায় আছি। কেউ-না-কেউ কোন না কোন দিন আমাকে এই মায়াজাল থেকে উদ্ধার করবেই। কিন্তু আমার আশা কবে যে পূর্ণ হবে কে জানে। একটা উপায় আছে তবে ..." বলতে বলতে যুবক থেমে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লাবণ্য ঐ যুবকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বলল "কি উপায়?"

সুব্রত লাবণ্যর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে গন্ধর্বরাণী নিজের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন। আমিও সেই

সময় তাঁর সাথেই থাকি। তখন কোন মানবী আমাকে যদি জড়িয়ে ধরে থাকে তাহলে আমি উদ্ধার পাব। গন্ধর্বরাণী অনেক কৌশল খাটাবেন। কিন্তু জোরে ধরে থাকলে আমি ঠিক উদ্ধার হতে পারব। কে আমার জন্য এত করতে যাবে? আমার প্রতি কার এত টান আছে! কে অত সাহস করবে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কেউ নেই! আমাকে উদ্ধার করার লোক ত্বনিয়ায় কেউ নেই। আমি একা! আমি বড় একা।"

এই কথা বলে গভীর নিশ্বাস ফেলে সুব্রত বলল, "সূর্য ডুবছে। আপনাকে হয়ত অনেক দূর যেতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে আপনার পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক হবে।"

"আপনি উদ্ধার অবিলম্বে পাবেন। আর বেশি দেরি নেই।" বলে লাবণ্য ফিরে গেল নগরের দিকে।

পূর্ণিমার আর বাকি ছিল চার দিন। ঐ দিন লাবণ্য শুধু সুব্রতর কথাই ভাবছিল। তাকে উদ্ধার করার কথা। ঠিক করল প্রয়োজন হলে সে নিজের জীবন দেবে।

পূর্ণিমার সন্ধ্যায় লাবণ্য একাই গন্ধর্ব উদ্যানে এল। লাবণ্য এমন পোষাক পরে নিল যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়। গাছের আড়ালে লাবণ্য লুকালো। নিজের চুল দিয়ে নিজেকে আরও ভাল ভাবে ঢেকে নিল। গভীর রাত হতেই গন্ধর্বরা জোড়ায় জোড়ায় বিহার করতে লাগল সেই উদ্যানে।

মধ্যরাত্রে সুব্রত এবং এক গন্ধর্বরাণী ঐ অঞ্চলে এল। লাবণ্য সহজেই বুঝতে পারল যে সুব্রতর সাথে যে আছে সে ঐ গন্ধর্বরাণী। ওরা কাছাকাছি আসতেই লাবণ্য মুহূর্তকাল অপচয় না করে সুব্রতকে জড়িয়ে ধরল।

গন্ধর্বরাণী কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পারল যে এতদিন পর সুব্রত তার হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন গন্ধর্বরাণী তার মায়াজাল বিস্তার করল।

গন্ধর্বরাণী সুব্রতকে এক অজগর সাপ করে ফেলল। লাবণ্য সেই সাপকেই বুকে জড়িয়ে ধরে রইল। পরক্ষণে সেই সাপ সিংহ হয়ে গেল। সিংহকে দেখে লাবণ্য ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তিতে বুকে জড়িয়ে ধরে রইল সেই সিংহকে। তারপর সেই সিংহ হয়ে গেল এক জ্বলন্ত শাবল। লাবণ্যর শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতেও লাবণ্য দমল না। জ্বলন্ত শাবলটাকে জড়িয়ে রইল বুকে। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করে রইল। তবু ছাড়ল না।

সুব্রতকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলে নিজের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু, নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও লাবণ্য যে বদ্ধপরিকর! এক মুহূর্তের জন্যও লাবণ্য তা ভোলেনি। কিন্তু কষ্ট সহ্য করারও একটা সীমা আছে। লাবণ্য আর পারছিল না। তারপর যে কি হল সে তা জানে না। যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সেই উদ্যানে কেউ ছিল না। সুব্রত তখনও তার আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল। পরক্ষণে সুব্রতও জ্ঞান ফিরে পেল।

"আপনি আমাকে গন্ধর্বরাণীর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। আমি যে কিভাবে এই ঋণ শোধ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। আগে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর নিজের বাড়ি ফেরার কথা ভাবব।" সুব্রত বলল লাবণ্যকে।

রাজকুমারী লাবণ্যকে দেখতে না পেয়ে রাজমহলের সবাই খোঁজাখুঁজি করছিল। রাজকুমারী সুব্রতসহ বাবার কাছে এসে সব কথা বলল। রাজা সব কথা শুনে সুব্রতকে বললেন, "তোমাকে বাঁচাবার জন্যই আমার কন্যা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে। তাই, তোমার চেয়ে তার আপনজন আর কে হতে পারে।"

তারপর রাজার আশীর্বাদে ও উদ্যোগে লাবণ্য এবং সুব্রতর বিয়ের ব্যবস্থা হল।

অচ্ছুত

কাবেরীর নদীতটে কাঞ্চনশর্মা নামে এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিল। সে ছিল ভীষণ রাগী। ঐ গ্রামেই একজন সাধু প্রকৃতির জ্ঞানী হরিজন ছিল। তার নাম মাধব।

এক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সবাই কাবেরী নদীতে স্নান করতে গেল। কাঞ্চনশর্মা নদীতে স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিল। ঠিক সেই সময় মাধবও স্নান সেরে ফিরছিল। হঠাৎ মাধবের ভেজা কাপড়ের অংশ কাঞ্চনশর্মার গায়ে লেগে গেল।

কাঞ্চনশর্মা রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে মাধবকে যা মুখে এল তাই বলল। মাধব গালাগাল সহ্য করল। "অন্ধকারে দেখতে পাইনি" বলে ক্ষমা চাইল। শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তাতেও কাঞ্চনশর্মার রাগ কমল না। সে মাধবের মাথায় লাথি মারল এবং গজগজ করতে করতে নদীতে আবার স্নান করতে গেল।

কাঞ্চনশর্মার পেছনে পেছনে গিয়ে মাধবও নদীতে স্নান করল। কাঞ্চনশর্মা মাধবকে বলল, "মুচিকে ছুঁয়েছি বলে আমি আবার স্নান করছি, তুমি আর একবার স্নান করছ কেন?"

মাধব জবাবে বলল, "ক্রোধ নামের মুচি এক সাধারণ মুচির চেয়ে নীচ বলে মনে করি। ঐ ক্রোধের ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই স্নান করছি।"

যক্ষপর্বত

আট

[তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূতকে মেরে তাদের কোমর যেন ভেঙ্গে দিল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। তারপর তারা শিথিল ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। পথে তাদের পূজারিণীর সেবকেরা ধরল। পূজারিণী ঐ দুজনকে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে বলল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত পাশের ঘরের সিংহকে পূজারিণীর সেবকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারপর···]

ক্ষুধার্ত সিংহ পূজারিণীর লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা প্রানপণে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু সিংহ যাকেই তার থাবার মধ্যে পেল তাকেই ঘায়েল করে দূরে ছুঁড়ে দিল।

খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত ভাঙ্গা দরজার এক ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হেসে বলতে লাগল, "ওরে পূজারিণীর চাকরের দল। পালাচ্ছিস কোথায়? চার পাঁচ দিন সিংহকে খেতে দিস নি! তোরা পালালে ও খাবে কি? প্রথমে তোদের কেউ এসে তার পেটে যা, তা না হলে প্রত্যেকেই সিংহের থাবা খাবি, ঘায়েল হবি।"

পূজারিণীর লোকদের তখন কথা শোনার অবস্থা ছিল না। তাদের চার পাঁচ জন
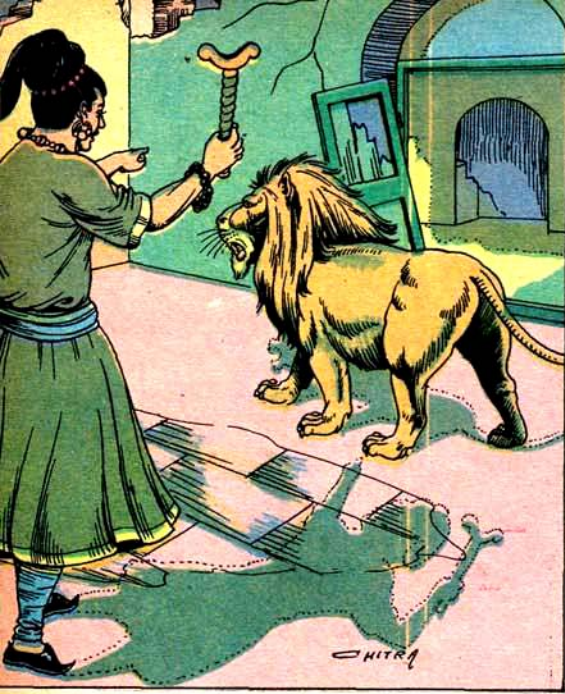
ইতিমধ্যেই ঘায়েল হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। একজন সিংহের মুখে আটকে চিৎকার করছিল। এর মধ্যে কয়েকজন কোন মতে বেঁচে গিয়ে ভাঙ্গা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল।

সিংহ একবার চারদিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হল সে কাউকে খেতে চায় না। পালাতে চায় বনে।

সিংহকে নিজের দণ্ড দেখিয়ে জীবদত্ত বলল, "সিংহরাজ! তুমি ভাবছ কাউকে খেলে তোমার ক্ষতি হবে। কেউ দেখে ফেলবে। তুমি আর কোনদিন পালাতে পারবে না। কোন ভয় নেই। এই পাশ দিয়ে সিঁড়ি আছে। এই পথ ধরে গেলেই তুমি শিথিল ভবনগুলো পাবে। সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে গেলেই বনে যেতে পারবে।" এই কথাগুলো বলতে বলতে জীবদত্ত সিংহের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে দণ্ড দিয়ে সিংহকে সিঁড়ির পথ দেখিয়ে দিল।

সিংহ গর্জন করতে করতে জীবদত্তের দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুটো পা তুলে দাঁড়াতেই জীবদত্ত সিংহের পেটের নিচে দণ্ড ঠেকিয়ে জোরে পাশে ঠেলে দিল। সেই ঠেলা খেয়ে সিংহ নিচে পড়ে গড়াতে গড়াতে সিঁড়িগুলা কামরার দরজার কাছে গিয়ে আটকে গেল।

"সিংহরাজ! এবার উঠে দাঁড়াও। পূজারিণীর সেবকেরা পূজারিণীর কাছে খবর দেওয়ার আগেই তুমি এখান থেকে পালাও। এ ছাড়া তোমার রক্ষা নেই!" জীবদত্ত দণ্ড তুলে সিংহের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ভাঙ্গা দরজার কাছে পূজারিণীর লোক-গুলো দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তারা অবাক হলো জীবদত্তের সাহস দেখে। কেমন করে দণ্ড দিয়ে সিংহকে ঠেলে দিল! ওদের একজন জীবদত্তকে নমস্কার করে

বলল, "হে মহাতান্ত্রিক শিরোমণি! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার মন্ত্রশক্তি সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। মহাশক্তি পূজারিণীকে বধ করে আপনিই শিথিল নগরের শাসনভার গ্রহণ করুন। আমরা আপনার অধীনে ভালভাবে থাকব। পূজারিণীর জ্বালায় আমরা মরে যাচ্ছি। একজন নারীর অধীনে থাকার চেয়ে একজন মহাবীরের সেবক হয়ে থাকা অনেক বেশী সম্মানের।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই ওর সাথী 'গুরুদ্রোহ! গুরুদ্রোহ!' বলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাঙ্গা দরজার কাছে দুজনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হল। পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে দুজনেই পা হড়কে নিচে পড়ে গেল। সিঁড়ির কাছে ছিল সিংহ। সে গর্জন করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত দণ্ড তুলে রেগে গিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, "তুমি সিঁড়ি থেকে নেমে সোজা নিজের পথ ধর। পূজারিণীর অনুচরদের ঝগড়ার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ো না। যাও, পালাও।"

সিংহ আগেই ঐ দণ্ডের গুঁতো খেয়েছিল তাই আবার সেই দণ্ড উঁচিয়ে জীবদত্ত কথা বলতেই সিংহ গোঁ গোঁ করতে করতে চলে গেল সেখান থেকে।

খড়্গবর্মা এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল। আর থাকতে পারল না। সে বলল, "জীবদত্ত, আমরাই বা এখানে আর থাকব কেন? এখন এখানে আর আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। আমরাও এখন এই শিথিল ভবন ছেড়ে চলে যেতে পারি।"

"ভাল কথা, সিংহ যে পথে গেছে আমরাও সেই পথে গিয়ে দেখে নিতে পারব গুহা থেকে বেরুনোর রাস্তা।" বলতে বলতে জীবদত্ত এগিয়ে গেল।

শিথিল ভবনে এখন আর তাদের মোকাবিলা করার কেউ নেই বলে ভাবাটা খড়্গবর্মার মোটেই উচিত হয়নি। কারণ

পূজারিণী ততক্ষণে খবর পেয়ে গেছে যে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত এখন মুক্ত। তার সেবকদের সিংহ আক্রমণ করেছে। সিংহের থাবা খেয়ে কয়েকজন সেবক ভীষণভাবে ঘায়েল হয়েছে।

খবরটা একজন সেবকের কাছ থেকে পেয়েই পূজারিণী চোখ লাল করে বলল, "হে মহাভূত! এ কেমন অদ্ভুত কাণ্ড! বৃদ্ধ পূজারীর মত মহান ব্যক্তিকেও আমি আমার মন্ত্রের প্রভাবে পরাজিত করে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছি! আমাদের শক্তি অপরিসীম। সাধারণ দুটো মানুষ আমাদেরই উপর আক্রমণ করল? আমার রাজ্যে ঢুকে আমারই লোককে অপমান করার মত সাহস ওরা পায় কোথা থেকে? এ আমি কোন মতেই সহ্য করব না! ওরে এই উজবুক সেবকের দল। আমাকে দেখিয়ে দে ঐ মানুষ দুটো কোথায়! আমি নিজে গিয়ে তাদের বন্দী করব।"

পূজারিণীর দুজন সেবক আগেই দেখেছিল জীবদত্ত এবং খড়্গবর্মার অসীম ক্ষমতা। ওরা দেখেছিল কি ভাবে ওরা সিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা দেখেছিল কি ভাবে ওরা লোমশ-ভূতকে ল্যাজে গোবরে অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। সে সব ঘটনা ওরা মনে রেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "মহাশক্তি পূজারিণী! মানুষ দুটো মনে হচ্ছে মস্ত বড় তান্ত্রিক। ওরা আমাদের তান্ত্রিক আর লোমশ-ভূতকে ..."

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই পূজারিণী ওদের একজনের পিঠে শূল ঠেকিয়ে বলল, "চুপ কর কাপুরুষের দল! আমি ঐ দুজনকে এখনই বন্দী করে ওদের মহাভূতের কাছে বলি দিতে যাচ্ছি। সর আমার পথ থেকে।" দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে পূজারিণী এগিয়ে চলল।

সেবকের দল ভয়ে ভয়ে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। তাদের সামনে যাচ্ছে তান্ত্রিক আর লোমশ-ভূত। তান্ত্রিক আর

লোমশ-ভূত পূজারিণীর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তারা কিছু একটা ভাবছে।

"গুরু! ওদের দুজনকে ধরে আমি কিন্তু খেয়ে ফেলব!" লোমশ-ভূত তান্ত্রিককে বলল।

"ওরে শিষ্য! এ রকম ভুল কাজ কখনও করো না। আমাদের শিথিল ভবনে যে দুজন যুবক এসেছে ওরা আমাদের পূজারিণীকে নিশ্চয়ই হারাবে। ওরা পূজারিণীকে হারালে আমি হব রাজা আর তুমি হবে মন্ত্রী। বুঝলে? তখন বুড়ো তান্ত্রিককে অন্ধকার কোঠর থেকে মুক্ত করে তার কাছ থেকে আমরা আরও কিছু মন্ত্রশক্তি লাভ করব।" তান্ত্রিক ফিস্ ফিস্ করে বলল।

লোমশ-ভূত তান্ত্রিকের কথা শুনে খুব খুশী হল। পিছনের দিকে একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "গুরু! কি মজা হবে! আপনি রাজা হবেন আর আমি হব মন্ত্রী।"

পূজারিণী এবং তার অন্য শিষ্যরা অনেক পিছনে আসছিল। পূজারিণী তার সেবক-দের নির্দেশ দিল শিথিল ভবন থেকে ঐ যুবক দুজনকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু ততক্ষণে খড়্গবর্মা এবং জীবদত্ত শিথিল ভবন ছেড়ে অন্য অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা বনের

পথের খোঁজ করছিল। কিন্তু যে গুহা দিয়ে ওরা ঐ শিথিল নগরে প্রবেশ করেছিল সেই গুহার কোন খোঁজ তারা পেল না।

"খড়্গবর্মা! আমরা যে পথে এই শিথিল নগরে ঢুকেছি তার তো কোন হদিশ পাচ্ছিনা। আমরা বাইরে বেরুবো কি করে! পূজারিণীর দু একজন সেবককে ধরে এনে পথ দেখাতে বলতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না।" জীবদত্ত বলল।

"মনে হচ্ছে পূজারিণীর সেবকদের নাগালের বাইরে অনেক দূর চলে এসেছি। ঐ সিংহটাব হল কি! সিংহটা এই শিথিল

ভবন থেকে বেরিয়ে বনের পথ ধরেনি তো ?” খড়্গবর্মা বলল।

“হয়ত সেও আমাদেরই মত এখানেই কোথাও আটকে গেছে। তুমি কি মাঝে মাঝে সিংহ গর্জন শুনতে পাচ্ছ না ?” জিজ্ঞেস করতে করতে জীবদত্ত শিথিল ভবনের একটি ঘরের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে বলল, “খড়্গবর্মা এদিকে দেখবে এসো ! দেখছ, কত ধন দৌলত এখানে ফেলে রাখা আছে। এগুলো নিশ্চয় পথচারীদের কাছ থেকে লুঠ করা জিনিস। মনে হচ্ছে এদের কারবারই লুণ্ঠন। ঘরে ঠাসা রয়েছে সব।” জীবদত্তের কথা শুনে খড়্গবর্মাও ঐ ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল। একটার উপর একটা বস্তা সারি সারি রাখা রয়েছে। কোনটাতে আছে গম আর কোনটাতে আছে ধান। আরও কত কি !

“তার মানে এই লোমশ-ভূতকে দেখিয়ে পথচারীদের ভয় পাইয়ে দিয়ে তান্ত্রিক আর তার লোকজন লুঠ করে। মনে হচ্ছে পূজারিণী অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। যা কিছু এরা করছে, মনে হচ্ছে পূজারিণীর পরিকল্পনাতেই করছে।” খড়্গবর্মা বলল।

“এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে যাতে এই খাদ্যের ভাণ্ডারে পূজারিণীর কোন লোক ঢুকতে না পারে। ওরা এখান থেকে খাদ্য না পেলে খুবই বিপদে পড়বে। ওরা খেতে পাবে না। খেতে না পেলে ওদের এই শিথিল ভবন থেকে বাইরে যেতেই হবে।” জীবদত্ত বলল।

“আমাদের দুজনের মনে একই চিন্তা এসেছে।” এই কথা বলে খড়্গবর্মা হেসে উঠল। তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে চকমকি পাথর বের করল। পাথর ঘষে আগুন ধরিয়ে দিল ঐ খাদ্যের বস্তায়।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। দেখতে দেখতে একের পর এক খাদ্যের বস্তায় আগুন ধরে

CHITRA.

যাচ্ছিল। ধোঁয়া আর আগুনে ঐ ঘর ভরে গিয়েছিল।

"আগুন ধরানো তো গেল। এবার কি করা যাবে?" খড়্গবর্মা বলল।

জীবদত্ত বলল, "আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। ভাল ভাবে আগুন ধরে গেলে এই ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্য পুড়ে যাবে। আবার আর একটা ব্যাপারও হবে। পূজারিণী আগুন লাগার খবর পেয়ে সেবকদের নিয়ে চলে আসবেন। তখন..."

জীবদত্তের কথা শেষ হতে না হতেই জ্বলন্ত ভাঁড়ার ঘরের পাশের ঘর থেকে মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল।

"খড়্গবর্মা, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। মানুষের আর্তনাদ যেন শুনতে পাচ্ছি!" বলতে বলতে জীবদত্ত তাড়াতাড়ি ঐ বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতে লাগল।

খড়্গবর্মা তার কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "জীবদত্ত, তাড়াহুড়োর মধ্যে তুমি বোধ হয় দরজায় লাগানো ঝুলন্ত তালাও দেখতে পাচ্ছ না। তুমি তোমার মন্ত্রদণ্ড দিয়ে আঘাত করে এই তালা ভেঙ্গে ফেল।"

তৎক্ষণাৎ জীবদত্ত নিজের মন্ত্রদণ্ড দিয়ে দরজার ঝুলন্ত তালায় জোরে মারল। তালা ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে খড়্গবর্মা দরজায় জোরে ধাক্কা মারল।

ঘরে অন্ধকার ঘন ছিল না। দরজার উপরের দিকের একটা জানালা দিয়ে ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। ঐ আলোতে দেখা গেল খুঁটির সাথে শেকল দিয়ে বাঁধা আছে এক বুড়ো। তার হাত হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। বুড়োটাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। তার লম্বা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছিল।

(আরও আছে)

প্রাণদান
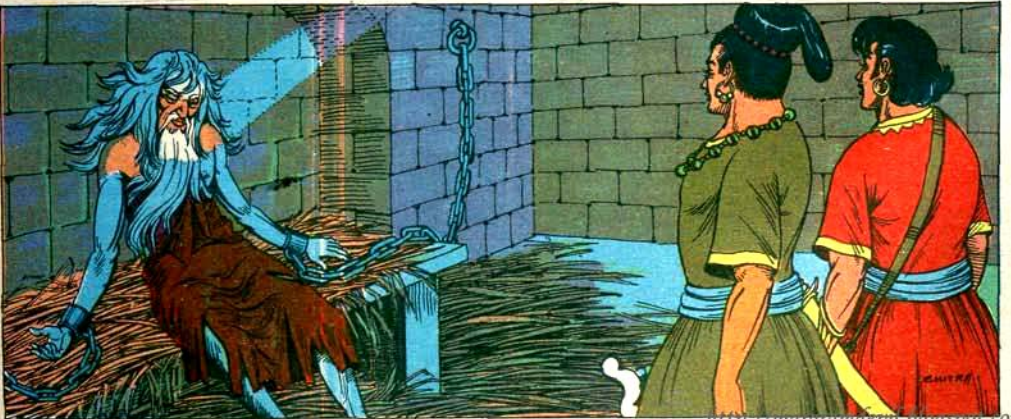
নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেলেন। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মতই নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, বহু বছর আগে মাধব নামে একজন বহু লোককে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আপনজনকে কোন রকম সাহায্য করেনি। তোমারও দেখছি সেই অবস্থা হচ্ছে। শুধু পরের জন্য খেটে মরছ। মাধবের কাহিনী একটু খুলে বলছি, তাতে তোমার খাটুনিও কমবে।"

বেতাল মাধবের কাহিনী শুরু করল ঃ পিনাকিনী নদীর ধারে সম্পন্ন পরিবারে মাধব নামে এক যুবক ছিল। তার শৈশব, কৈশোর কেটেছে খুব বেশী আদর যত্নে। বিপদ-আপদে সে কোনদিন পড়েনি। যথা-

বেতাল কথা

সময়ে লেখাপড়া করার কষ্টও সে করেনি। তাই লেখাপড়া তার আর হল না। তার জমি জায়গা ছিল অনেক। তাই, মাধবের বাবা-মা তাকে লেখাপড়া করতে জোর করেনি। মাধবের যা ইচ্ছে তাই তাকে করতে দিত।

মাধব বড় হল। তার ইচ্ছে করল শহরে যাওয়ার। বাবা মাকে নিজের ইচ্ছা জানাল। ওর বাবা মা বারণ করল না। মাধব জমি জায়গা সব বিক্রী করে শহরে চলে গেল। ঐ শহরের নাম বিক্রমসিংহপুর। শহরে ভাল বাড়ি কিনল। বাকি সমস্ত অর্থ দিয়ে ব্যবসার জিনিস কিনে যত্ন করে ভাণ্ডারে রেখে দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। একদিন তার বাড়িতে আগুন ধরে গেল। মাধব কোন রকমে আগুনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল। কিন্তু পারল না তার বাবা, মা ও ব্যবসার জিনিস উদ্ধার করতে। ধনী মাধব ভিখারী হয়ে গেল। বাঁচার পথ তার সামনে খোলা ছিল না।

কিন্তু ভিক্ষে করতেও তার মন চাইল না। তাই সে ঠিক করল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। একদিন গভীর রাত্রে সে চুপিচুপি পিনাকিনী নদীতে ঝাঁপ দিতে গেল।

হঠাৎ সেই অন্ধকারে গাছের নিচে থেকে অজানা অচেনা কে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "বাবা তুমি যাচ্ছ কোথায়? কি করতে যাচ্ছ?"

মাধব সেই গাছের নিচে গেল। সেখানে এক মুনিকে দেখতে পেল। মাধব মুনিকে নিজের কাহিনী শোনাতে গেল। মুনি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আমি তোমার সমস্ত কাহিনী ভালভাবেই জানি। এই জগতে কি ভাবে বাঁচতে হয় তা তুমি দেখছি মোটেই জান না। তুমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাইছ বটে কিন্তু তুমি তা কিছুতেই পারবে না।"

"কেন মুনিবর?" মাধব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

“তোমার আয়ু যে একশ বছর। একশ বছর না হলে তুমি মরবে কি করে?” মুনি বলল।

এ কথা শুনে মাধব মোটেই খুশী হল না। আরও ঘাবড়ে গিয়ে সে বলল, “আমার এখন এক মুঠো খাবারের জোগাড় করারই ক্ষমতা নেই। আর আপনি বলছেন কিনা আমি একশ বছর বাঁচব? বাঁচা আমার কাছে নরক যন্ত্রণা। মুনিবর, এখন আমাকে কি একশ বছর ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?”

মুনি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “তুমি টাকা পয়সা ছাড়া বাঁচতে পারবে না? তুমি কি টাকা পয়সা রোজগার করতে চাও? বল তাহলে আমি একটা উপায় বলে দেব। মরা মানুষকে তুমি নিজের আয়ু থেকে ভাগ দিয়ে বাঁচাতে পারবে। এই ভাবে একটু একটু আয়ু বিক্রি করে অনেক রোজগার করতে পারবে। কিন্তু মনে রেখ যত আয়ু তুমি বিক্রি করবে তোমার একশ বছর থেকে কিন্তু তত বছর কমবে।” মাধব ভাবল মুনির কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো তার জীবনে কোন সমস্যাই থাকবে না।

মুনির কাছে মাধব মন্ত্র নিল। কি করে অন্যকে বাঁচাতে হয়। কি করে আয়ু বিক্রি করতে হয়।
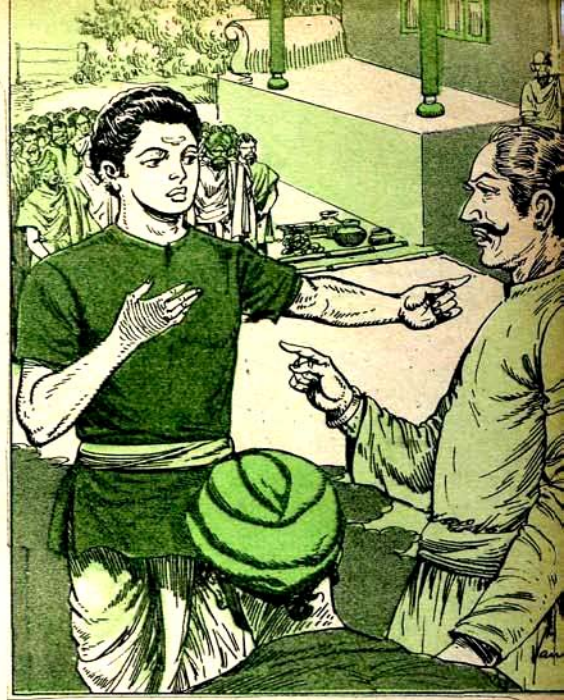
তারপর সে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে সকালে একটি গ্রামে পৌঁছাল। ঐ গ্রামে এক ধনীর বাড়ির সামনে অনেক লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। আগের দিন রাত্রে নাকি ঐ ধনী লোকটা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

মাধব ঐ ধনীর আত্মীয়দের কাছে গিয়ে বলল, “আমি একে বাঁচিয়ে দিলে তোমরা আমাকে কি দেবে?”

তার কথা শুনে সবাই অবাক হল। বিশ্বাস করল না তার কথা।

“আমি বাঁচাতে না পারলে কারও কোন ক্ষতিতো হবে না? বাঁচাতে পারলে কি দেবে তাই জিজ্ঞেস করছি।” মাধব বলল।

"এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেব। তুমি যদি পার বাঁচিয়ে তোল।" ধনীর আত্মীয়রা বলল।

মাধব হাত পা ধুয়ে নিল। একটা জল ভর্তি পাত্র নিয়ে মড়ার কাছে বসল। মন্ত্র পড়ে নিজের আয়ুর অংশ দান করতে করতে মড়ার উপর জলের ছিটে দিল। সাথে সাথে মড়া নড়ে উঠল। ধনী বেঁচে উঠল। মাধবকে ওরা শুধু যে স্বর্ণমুদ্রা দিল তাই নয় বস্ত্র ও বাহন দিয়ে তাকে প্রণাম করল।

স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে মাধব নিজের শহরে ফিরে এল। তার যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রতিদিন পাল্কীতে করে বহু মড়া তার বাড়ীর সামনে লোকে আনত।

মাধবের জীবন দানের ব্যবসা জোর জমে উঠেছিল। ওর বাড়ীতে ধন সম্পত্তির যেন বৃষ্টি হতে লাগল। বহু গরীবও মড়া নিয়ে হাজির হত, প্রাণ দান করতে অনুরোধ করত তাকে।

মাধব অল্পদিনের মধ্যেই কোটিপতি হয়ে গেল। তা সত্বেও তার প্রাণ দানের ব্যবসা দিনের পর দিন বাড়ছিল। সে সতর্ক হল। অল্প অল্প দিনের আয়ু বণ্টন করতে লাগল। শুধু মাধব নিজে জানত সে কতদিনের আয়ু বণ্টন করতে পারে। অন্যেরা ভাবত মাধব অফুরন্ত আয়ু বণ্টন করতে পারে।

মাধব যোগ্য এক মেয়েকে বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই তার বউ মারা গেল। মাধব নিজের বউকে আয়ু দান করে বাঁচাল না। শাস্ত্র মতে স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কর্মাদি সারল।

সবাই অবাক হল। যে লোকটা এত লোককে বাঁচাতে পেরেছে সে নিজের বউকে বাঁচাতে পারল না! লোকে ভাবতে লাগল মাধবের আর বাঁচানোর ক্ষমতা নেই। যে ক্ষমতা দেখিয়ে মাধব হাজার হাজার মানুষকে অবাক করেছিল, সেই ক্ষমতা যে মাধবের হারিয়ে গেছে লোকে তার প্রমাণ হাতেনাতে পেয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে যারাই মড়া নিয়ে মাধবের কাছে যেত তাদের সবাইকে

মাধবের প্রতিবেশীরা বলত, "আরে তোমরা কার কাছে এসেছ! যে মাধব নিজের বউকে বাঁচাতে পারল না সে অন্যকে বাঁচাবে কি করে?" এ কথা শুনে লোকে ফিরে যেত হতাশ হয়ে। ক্রমে ক্রমে মড়া আর কেউ আনত না। এর পর আশী বছর বয়স পর্যন্ত মাধব ভাল ভাবে বেঁচেছিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। যে মাধব এত লোককে বাঁচিয়েছে সে নিজের স্ত্রীকে বাঁচাল না কেন? ওর স্ত্রীর কাছে টাকা পয়সা পাবে না বলে? না কি সে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসত না? স্ত্রীকে না বাঁচিয়ে মাধব নিজের সুনাম ক্ষুন্ন করল কেন? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

তারপর বিক্রমাদিত্য বললেন, "মাধব ব্যবসা করছিল। ওর ব্যবসার মূলধন ছিল ওর নিজের আয়ু। সীমিত আয়ু থেকে কিছু কিছু বণ্টন করে সে টাকা পয়সা রোজগার করছিল। সে সুনাম অর্জনের জন্য এসব করেনি। তার টাকা পয়সা যখন হয়ে গেল তখন সে ঠিক করল, আয়ু বিক্রির ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু তার যশ এবং সুনাম এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল যে তার পক্ষে ব্যবসা বন্ধ করা অসম্ভব ছিল। একমাত্র সুনাম ক্ষুন্ন করা ছাড়া ব্যবসা বন্ধের অন্য কোন উপায় ছিল না। ঠিক এই সময় তার স্ত্রী মারা গেল। স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মাধব তাকে বাঁচাল না। নিজেকে সে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল। তাই সে ত্যাগ করল নিজের সুনাম এবং স্ত্রীকে। মাধব তা না করলে অন্যদের বাঁচাতে বাঁচাতে নিজে মরে যেত।"

রাজার এই ভাবে মৌন ভাব ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথেই বেতাল শব নিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। (কল্পিত)
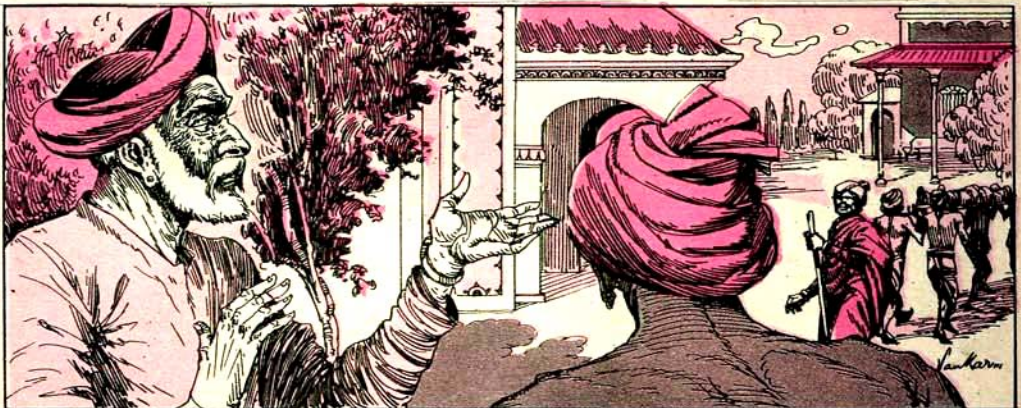
গোঁফের দাম

এক গ্রামে এক কুলীন ধার্মিক ছিলেন। ঐ গ্রামের প্রত্যেকেই ঐ ধার্মিক লোকটির কাছে উপকৃত ছিল। দান-ধর্ম করতে করতে ঐ ধার্মিক ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে দান করবেন কি, নিজের খাবারের পয়সা ছিল না। তারপর একদিন বাধ্য হয়ে ঐ ধার্মিক ঐ গ্রামের এক বণিকের কাছে গিয়ে বললেন, "মশাই, আমাকে পঁচিশটা টাকা ধার দিন। বন্ধক রাখার মত আমার হাতে কিছুই নেই। অগত্যা, আপনি আমার গোঁফের একটি চুল বন্ধক রেখে ধার দিন।"

বেনে তৎক্ষণাৎ ঐ কুলীন ব্যক্তিকে ধার দিয়ে বিদায় দিল। তা লক্ষ্য করে বেনের চাকর দীনু বলল, "কর্তা, ঐ কুলীন ধার্মিকের গোঁফের একটি চুল নিয়ে পঁচিশ টাকা দিয়েছেন; আমার গোঁফের সমস্ত চুল নিয়ে একশো টাকা দিন না।"

"আরে দীনু, এখন যে গোঁফের দাম পড়ে গেছে। একদিন এই কুলীন ধার্মিক লোকটা আমার গোঁফের একটা চুল একশো টাকায় কিনে ছিল। এখন পঁচিশ টাকা। তুমি চাওতো বল, আমার গোঁফের চুল দশ টাকা করে বিক্রি করে দিচ্ছি। তুমি সেটা বিক্রি করে লাভ করতে পার।"

— শিখা দে

উপায়

তাসখন্দ শহরে মীরকমল নামে এক ব্যবসাদার ছিল। সে আর তার বউ ছিল খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। তাদের কোন সন্তান ছিল না। তাই অন্য কোন সমস্যা ছিল না। মীরকমল সপ্তাহে ছদিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকত। আর শুধু বুধবার সারাদিন বাড়িতে থাকত।

কোন এক বুধবার মীরকমলের বউ কাঁদতে কাঁদতে বলল তার স্বামীকে, "আমি আর পারছি না। একা একা টানা ছদিন এই বাড়িতে থাকতে। তুমি একটা ছাগল ছানা কিনে আনলে তো পার।"

মীরকমল দু বছর বয়সী একটা দুর্বল ভেড়া পথ থেকে কিনে আনল সস্তা দামে। তারপর থেকে মীরকমলের বউ জমীরার সময় ভাল কাটছিল। সব সময় ভেড়া ডাকতে থাকে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি অনেক ঘাস ছিল, ভেড়া ওখানে ঘুরে বেড়াত। যা পেত তাই খেত। কিন্তু তার ডাক কমত না। সারাদিন সারারাত সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে আর কাশে। আর খায়।

পরের বুধবার মীরকমল বাড়িতে রইল। জমীরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তুমি আমাকে শেষ করতে চাও। সেই জন্যই এই ভেড়াটাকে কিনে এনেছ। হয় এই ভেড়াটাকে কোথাও রেখে এসো আর না হয় আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

"বাপের বাড়ি যাবে কেন? দেখছি কি করা যায়।" মীরকমল বলল।

সেইদিন মীরকমল নিজের মার কবরের কাছে গেল। উদ্দেশ্য প্রণাম করা। কবরের উপর অনেক ঘাস দেখে মীরকমল ভাবল, এই ঘাস ভেড়াকে খাওয়ালে ভালই হবে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভেড়াটাকে নিয়ে

শুভেন্দু কর্মকার

গেল। কবরের পাহারাদারকে বলল, "আরে ভাই আমি বুড়ো হয়েছি। আমার ছেলে-মেয়ে নেই। আমাকে যখন আল্লাহ ডাক দেবে তখন তো হঠাৎ আমাকে চলে যেতে হবে। তুমিই আমাকে কবর দেবে। খরচ পত্তর কে দেবে না দেবে ঠিক নেই। তাই, আগে ভাগে তোমার কাছে এই ভেড়াটাকে জমা রাখতে চাই।"

কবরের পাহারাদার রাজী হল।

ছুমাস কেটে গেল। একদিন মীরকমল কবরের কাছে গিয়ে ভেড়াটাকে চিনতে পারল না। ভেড়াটা মোটা হয়ে গেছে।

এর ওজন দেখছি ছুমনের কম হবে না। এতবড় ভেড়াটাকে কবরের পাহারাদারকে ফোকটে দেওয়া বোকামো হয়েছে। যে কোন ভাবে ভেড়াটাকে ফেরত নিতেই হবে। মীরকমল মনে মনে ভাবল।

তারপর সে পাহারাদারের কাছে গেল। তাকে বলল, "আরে ভাই, আমি এক বড় বিপদে পড়ে গেছি। একটা ছেলে অসুখে পড়েছিল। তাকে আমি আধ চামচ রস-কর্পূর দিয়েছি। ছেলেটা হঠাৎ মারা গেছে। কাল আমাকে তাসখন্দ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমার উপর আদেশ হয়েছে। তুমিও চল আমার সাথে।"

"আমি কেন যাব তোমার সাথে?" পাহারাদার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"যাবে না মানে? যেতেই হবে। আমাকে কবর দেবার কথা আছে না! সেই শর্তেইতো আমি তোমাকে আমার ভেড়া দিয়েছি।" মীরকমল বলল।

"আরে দূর তুমি যেখানে মরতে যাচ্ছ, যাও না। তুমি মর। আর সেখানে তোমার ভেড়াটাও মরুক।" কবরের পাহারাদার ধিক্কার দিতে দিতে বলল।

মীরকমলের কৌশল খেটে গেল। তাই সে মহা আনন্দে নাচতে নাচতে ভেড়াটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।
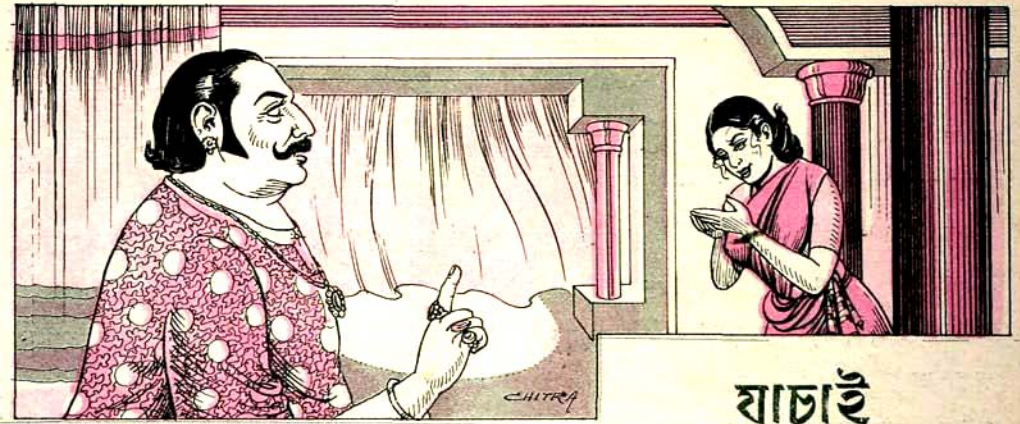
যাচাই

এক জমিদারের বাড়িতে রামী নামে এক ঝি ছিল। তার স্বামী সেই জমিদারের কাছেই কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছর আগে সে মারা গেছে।

জীবন নামে রামীর এক ছেলে ছিল। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান কিন্তু ভীষণ অলস। একদিন রামী তার ছেলেকে বলল, "তুমি কাজকর্ম কিছু করবে না? এভাবে চললে বাঁচবে কি করে? খাবে কি?"

জীবন বলল, "মা, আমাকে কোন কাজ পাইয়ে দাও না, দেখবে ঠিক কাজ করব।"

রামী খুব খুশী হল। সে জমিদারকে বলল। তার কথা শুনে জমিদার বলল, "তুমি বলছ কিন্তু অলস ছেলেকে কি কাজ দেব বলত? তোমরা স্বামী স্ত্রীতে আমার এখানে কাজ করেছ, তাই তোমার অনুরোধ সরাসরি ফেলতে পারছি না। ঠিক আছে নিয়ে এস, দেখি কি করতে পারি।"

পরের দিন রামী জীবনকে নিয়ে এল। জমিদার জীবনকে বলল, "তুমি আমার মোষ চরাতে পার। তবে মনে রেখ, এক একটা মোষের দাম পাঁচ পাঁচশো টাকা। একটা মোষ হারিয়ে গেলে তোমার কাছে পাঁচশো টাকা আদায় করব।" তারপর রামীকে জমিদার বলল, "তোমার ছেলে যদি কোন দোষ করে তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে।"

রামী ভাবল, মোষের দাম তো পাঁচশো হবে না। তবে জীবনকে ভয় পাইয়ে দিতে জমিদার বেশী দাম বলে ভালই করেছেন।

সেদিন থেকে জীবন জমিদারের মোষ চরাতে লাগল। কিন্তু মোষ চরানো জীবনের একদম ভাল লাগছিল না। কারণ সে একটু লেখাপড়া জানত। হিসেব কষতে

রাখাল দাস

পারত। জমিদার তাকে অন্য কোন ভাল কাজ দিলে পারত। জীবনের ইচ্ছা করল মনের কথা জমিদারের কাছে জানাতে। কিন্তু ভাবল কেমন করে জানাবে।

একদিন জীবন অন্য একটা ছেলেকে জমিদারের মোষ চরানোর ভার দিল। তাকে জিলিপী খেতে দিল। নিজে চলে গেল অন্য গ্রামে। সাথে নিল একটা মোষ। মোষের পিঠে চুন দিয়ে লিখে দিল, "এই মোষের দাম এক টাকা। যে কিনতে চাও সন্ধ্যার সময় মাঠে এসো।"

মাত্র এক টাকা দিয়ে মোষ কেনার আশায় প্রায় দু হাজার লোক সন্ধ্যার সময় মাঠে পৌঁছাল। জীবন ওদের বলল, "আপনারা সবাই এক টাকায় মোষ কিনতে চান। আমিও বেচতে চাই। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে পাবেন কি করে। তাই ভাবছি ভাগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। যাঁরা ভাগ্য পরীক্ষার খেলায় যোগ দিতে চান তাঁরা একটা করে টাকা দিন।" সবাই জীবনকে একটা করে টাকা দিল। জীবন প্রত্যেকের নাম আলাদা আলাদা কাগজের টুকরোতে লিখে দিল।

যারা জড় হয়েছিল তাদের একজনকে কাগজের টুকরো জীবন তুলতে বলল। যার নামের কাগজের টুকরো উঠল তাকে ঐ মোষটা দিয়ে জমিদার বাড়ি পৌঁছাল। জমিদারকে সে বলল, "আপনার মোষ হারিয়ে গেছে। এই নিন আপনার টাকা।" এই কথা বলে জীবন সমস্ত টাকা জমিদারের সামনে রেখে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

জমিদার সব শুনে বলল, "আরে জীবন, তোমার যে এত বুদ্ধি তাতো জানতাম না। না না তোমাকে আর মোষ চরাতে হবে না।" বলে, জমিদার জীবনকে কিছু টাকা উপহার দিয়ে তাকে হিসেবের খাতা দেখার ভার দিল। ছেলের বুদ্ধির এবং নতুন কাজের কথা শুনে রানী খুশী হল।

চোরের রাজা
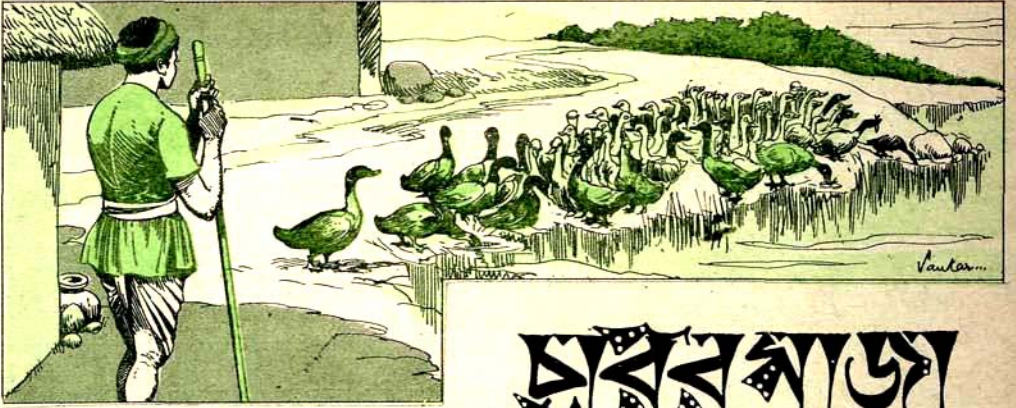
কৃষ্ণা নদীর তীরে এক গ্রামে গঙ্গারাম ও যমুনাদাস নামে দুজন কিষাণ ছিল। গঙ্গারাম ছিল অলস এবং ধূর্ত। আর যমুনাদাস ছিল পরিশ্রমী ও নম্র স্বভাবের। সেইজন্য যমুনাদাসের ক্ষেতে ফসল হত বেশি। তার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু গঙ্গারাম ক্ষেত খামারের কাজে মন দিত না। সে সব সময় নিজের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা মেরে বেড়াত।

যমুনাদাসের কাছে টাকা পয়সা জমলে সে ডিমের ব্যবসা করতে আরম্ভ করল। ডিমের ব্যবসাতেও তার অনেক লাভ হল।

গঙ্গারামকে তার বন্ধুরা বলল, "যমুনাদাস ডিমের ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে। তোমার ক্ষেতে তো বেশি ফসল হয় না। তাই, তুমিও ডিমের ব্যবসা কর না কেন?" গঙ্গারাম যমুনাদাসের বাড়ি গেল। ডিমের ব্যবসার সব কথা জানতে চাইল। অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে সব কথা খুলে বলল যমুনাদাস।

গঙ্গারাম কয়েকটা মুরগী কিনে আনল। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক মত পোষার ধৈর্য্য তার ছিল না। যমুনাদাস মুরগীর কাছ থেকে বেশি ডিম পেত।

যমুনাদাস ও গঙ্গারামের দোকান দুটো পাশাপাশি ছিল। গঙ্গারাম বেশি লোভী ছিল। সুযোগ পেলেই সে যমুনাদাসের দোকান থেকে ডিম চুরি করত।

যমুনাদাসের দোকান থেকে গঙ্গারাম প্রায় প্রত্যেক দিন ডিম চুরি করত। একদিন হাতে নাতে গঙ্গারামকে ধরে আর কোন দিন চুরি না করতে শাসিয়ে দিল যমুনাদাস। কিন্তু স্বভাব না যায় মলে। সে ঠিক এক ফাঁকে চুরি করে নিত।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

একদিন বাধ্য হয়ে যমুনাদাস বিচারপতির কাছে গঙ্গারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। সেদিন তার কুড়িটা ডিম চুরি করেছিল। গঙ্গারাম বিচারপতির কাছে চুরি করার ব্যাপারটা অস্বীকার করল। প্রমাণের অভাবে বিচারপতি যমুনাদাসের অভিযোগ গ্রহণ করতে পারল না।

যমুনাদাস ভাবনায় পড়ে গেল। তার ঐ অবস্থা দেখে বউ বলল, "তুমি এত ভাবছ কেন? ভাবলে ঐ চোরটার কি হবে? ওকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া যায় তাই ভাব।"

"আমি অনেক ভেবেছি। আর ভাবতে পারছি না। কোন উপায় বের করতে পারছি না।" যমুনাদাস জবাবে বলল।

"আমার মামা গণপতি মন্ত্রতন্ত্র জানে। তার কাছ থেকে পরামর্শ নাও না কেন?" যমুনাদাসের বউ বলল।

"ঠিক আছে কাল সকালে যাব। পরামর্শ করে দেখি কি বলেন।" যমুনাদাস বলল। পরের দিন সকালে যমুনাদাস গণপতির বাড়ি গিয়ে নিজের কথা জানাল।

গণপতি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "যমুনা-দাস, আমার কথামত চললে চোর সহজেই ধরা পড়বে।" তারপর যমুনাদাসকে একটা উপায় গণপতি জানিয়ে দিল।

ফেরার পথে যমুনাদাস কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফিরে একা একটা ঘরে বসে কি যেন করে নিল।

যমুনাদাসের সেদিন ডিম নিয়ে দোকানে যেতে দেরি হল। ডিমের ঝুড়ি দোকানে রেখে জল খেয়ে আসার নাম করে সে দোকান ছেড়ে চলে গেল। তার ফেরার আগেই গঙ্গারাম কিছু ডিম চুরি করে নিল।

যমুনাদাস কিছুক্ষণ পর দোকানে ফিরে এসেই বুঝতে পারল যে তার কিছু ডিম চুরি হয়ে গেছে। সে চিৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!" তার চিৎকার শুনে সেপাই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হোল ভাই, চেঁচাচ্ছ কেন?"

"এই গঙ্গারাম আমার ডিম চুরি করেছে।" যমুনাদাস অভিযোগ করল।

“এ ঢাহা মিথ্যা কথা।” গঙ্গারাম বলল।

“যমুনাদাস, তুমি এর আগেও একবার চুরির অভিযোগ করেছিলে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারনি।”

“কিন্তু এবার আমি প্রমাণ করে দেব।” যমুনাদাস বল্‌ল।

গঙ্গারাম ও যমুনাদাস নিজের নিজের মালপত্র নিয়ে বিচারালয়ে গেল। যমুনা-দাসকে দেখেই বিচারপতি বলল, “তুমি আবার এলে?”

“আজ্ঞে হুজুর যমুনাদাস বলছে গঙ্গারাম তার ডিম চুরি করেছে।” সেপাই বিচার-পতিকে বলল।

“কোন প্রমাণ আছে?” বিচারপতি জিজ্ঞেস করল।

“গঙ্গারাম কাঁচা ডিম বিক্রি করে, তার কাছে সিদ্ধ করা ডিম থাকে কি করে? আজকে আমি ইচ্ছে করে সিদ্ধ করা ডিম এনেছিলাম।” যমুনাদাস বলল।

“আমার বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে আমিও আজকে কিছু ডিম সিদ্ধ করে এনেছিলাম।” গঙ্গারাম বলল।

“হুজুর, আপনি গঙ্গারামের ঝুড়ির সিদ্ধ ডিমগুলো ভেঙ্গে দেখে নিন। চোকলার নিচে আমার নাম লেখা আছে। আপনি দয়া করে যাচাই করে দেখুন।” যমুনাদাস বলল।

"ভাল কথা। দেখছি।" এ কথা বলে বিচারপতি গঙ্গারামের ঝুড়ি থেকে ডিম বের করাল। ভাঙ্গিয়ে তাতে যমুনাদাসের নাম লেখা আছে কিনা পরীক্ষা করাল। সিদ্ধ ডিমের চোকলার নিচে যমুনাদাসের নাম লেখা ছিল।

যমুনাদাস হাসতে হাসতে বলল, "হুজুর, আপনি গঙ্গারামকে জিজ্ঞেস করুন, কিভাবে, কোন্ জাদু বলে ডিমের চোকলার ভিতরে সে নাম লিখল।"

গঙ্গারাম কোন জবাব দিতে পারল না। বিচারপতি বুঝতে পারল যে গঙ্গারাম ডিম চুরি করেছে। তাই গঙ্গারামকে সাজা দিল বিচারপতি।

যমুনাদাস খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে বউকে বলল, "গঙ্গারামের চুরির উপযুক্ত শাস্তি দিতে পেরেছি।"

"তুমি প্রমাণ করলে কি করে যে গঙ্গারাম চোর।" যমুনাদাসের বউ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। যমুনাদাস হাসতে হাসতে তাকে বলল, "গঙ্গারাম যে ডিমগুলো চুরি করেছিল সেই ডিমগুলোর চোকলার নিচে আমার নাম লেখা ছিল। সেই নাম দেখেই বিচারপতি ভালভাবেই বুঝল যে গঙ্গারাম চোর।

"আচ্ছা, ডিমের চোকলার নিচে তোমার নাম লেখা ছিল কি করে?" যমুনাদাসের বউ জিজ্ঞেস করল।

"বলছি। গণপতি মামার কাছে যা শিখেছি তাই করেছি। মামার কাছ থেকে ফেরার পথে আমি দোকান থেকে অম্লসুরা আর ফিটকিরি কিনে এনেছিলাম। তারপর ঐ অম্লসুরা ও ফিটকিরি মিশিয়ে যে দ্রব-পদার্থ তৈরি হল সেই পদার্থ দিয়ে ঐ ঘরে একা একা বসে ডিমের উপর আমার নাম লিখেছিলাম। সেটা শুকিয়ে যাওয়ার পর তুমি ডিমগুলো সিদ্ধ করলে। ব্যাস, এই যা করেছিলাম।" যমুনাদাস বলল।
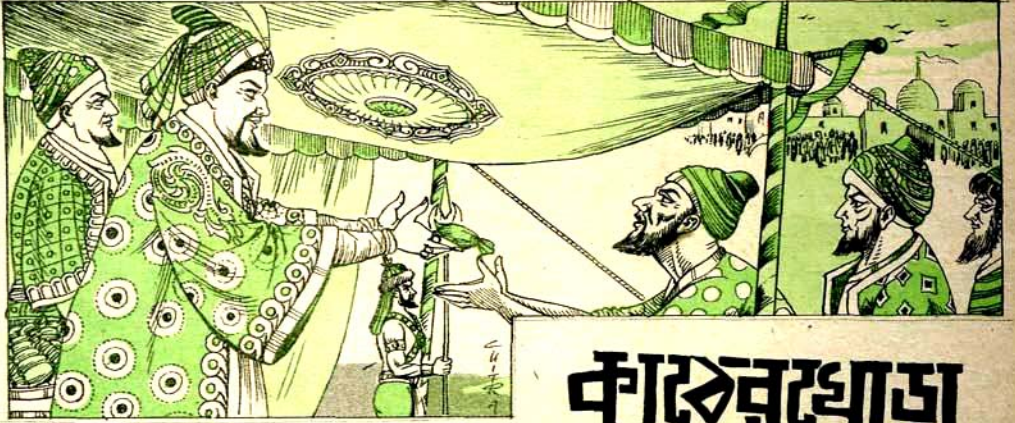
কাঠের ঘোড়া

কয়েকশো বছর আগেকার কথা। পারস্যের বাদশাহ ছিলেন সাবুর। মস্ত বড় নাম করা বাদশাহ। ধন সম্পত্তিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

যারা তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাততো তিনি তাদের কিছু দিতেন। খালি হাতে ফেরাতেন না। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল বিরাট অনুরাগ। উৎসাহ দিতেন নানা ভাল কাজে।

বাদশাহের ছিল তিনটি চাঁদপানা মেয়ে। ছেলে মাত্র একটি।

রাজধানীতে বছরে দুবার উৎসব হত। একটা নওরোজ বা নতুন বছরের আর অন্যটি মিহিরগান বা শারদোৎসবের। এই দুটো উৎসবের সময়েই দুদিন ধরে মেলা বসত। দোকানপাট আর মানুষের ভিড় হত দেখবার মত। নাচ গান তামাশার ব্যবস্থাও থাকত। নানা দেশের শিল্পী আসত ঐ মেলায়। রাজাকে নতুন নতুন জিনিস দেখিয়ে বকশিশ নিয়ে যেত।

একবার নওরোজ উৎসবের শেষের দিকে তিনজন শিল্পী এক সাথে বাদশাহের কাছে হাজির হল। তিন জনের দেশ তিন জায়গায়। আলাদা দেশের মানুষ হলেও তিনজনই শিল্পী। বাদশাহকে সেলাম করে ওরা দাঁড়াল। ঐ তিনজনের একজন হল হিন্দু। খোদ ভারতবর্ষের লোক। অন্যজন ছিল রোমের। আর তৃতীয়জন পারস্যেরই অধিবাসী। ওরা প্রত্যেকে বাদশাহের জন্য নতুন ধরণের অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এল। বাদশাহ তাদের দেখে খুব খুশী হয়ে তাদের ভেতর থেকে এক একজন শিল্পীকে ডাকলেন। প্রথমে ডাক পড়ল ভারতবর্ষ থেকে আসা শিল্পীর।

আরব দেশের লোককথা

"কি এনেছ ?" বাদশাহ বললেন।

ভারতবর্ষের লোক একটা সোনার মানুষ দেখাল। সোনার মূর্তির হাতে একটা সোনার ভেরী।

"এই মূর্তির কি গুণ আছে ?" বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন।

"হুজুর, এর গুণ হল পাহারা দেওয়া এবং মেরে ফেলা। একে সদর দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলে শত্রু দরজার কাছে এলে ভেরী বেজে উঠবে। আর ঐ শত্রু সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে।"

শিল্পীর বর্ণনা শুনে বাদশাহ খুশী হয়ে বললেন, "এ যদি সত্য হয়, তুমি যত বকশিশ চাইবে, পাবে।"

তারপর রোমের লোকটির ডাক পড়ল। গ্রীক শিল্পী কুর্ণিশ করে দাঁড়াল।

"তুমি নতুন কি এনেছ ?" বাদশাহ বললেন। সাথে সাথে রোমের শিল্পী বাদশাহের সামনে একটি রুপোর থালার উপর বসানো সোনার মুরগী রাখল। ঐ মুরগীর আশেপাশে চব্বিশটি মুরগীর ছানা। সেগুলোও সোনার তৈরি। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে রোমের পণ্ডিত। এত, এতগুলো বাচ্চা আর একটি মুরগী! এরা কি করবে ?"

"হুজুর প্রত্যেক ঘণ্টায় মুরগীটা তার এক একটা বাচ্চার গায়ে ঠোকর মারবে। আর সাথে সাথে পাখা ঝাপটাবে। প্রত্যেক
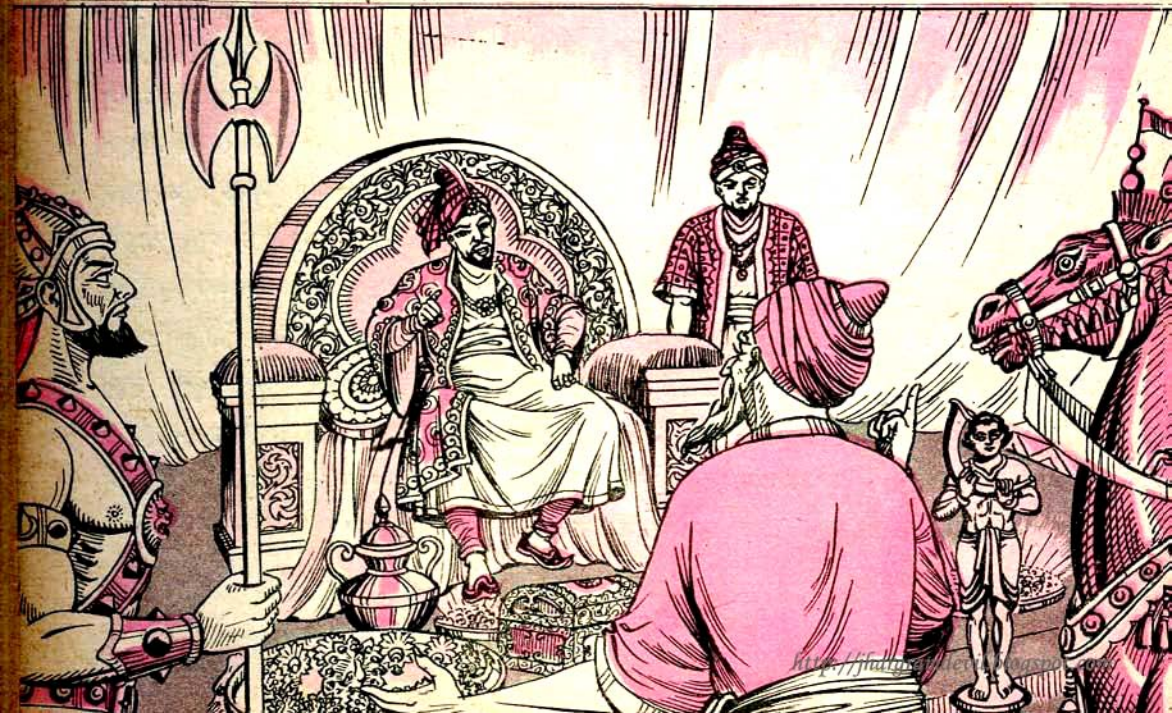
ঘণ্টায় ডাক শুনতে পাবেন। ডাকার সময় ঈদের চাঁদও দেখতে পাবেন তার গলায়।” রোমের পণ্ডিত বলল।

“চমৎকার ব্যাপার তো! সত্য হলে বকশিশ দেব।” বাদশাহ বললেন।

তারপর বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, “তোমার কি আছে, দেখাও।”

পারস্যের শিল্পী একটা দামী কালো কাঠের তৈরি ঘোড়া রাখল। চমৎকার তার গড়ন। রূপে রেখায় জীবন্ত। ঝক ঝক করছে। জিন, লাগাম ও রেকাব আছে। তাতে আবার সোনা মনি মুক্তোর বাহার।

বাদশাহ কোন কথা শোনার আগেই বললেন, “বা! ঘোড়াটাকে তো দেখতে বেশ! এর কি কোন গুণ আছে না কি সুন্দর দেখতে এই যা?”

“এর গুণ হুজুর এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। মন যত তাড়াতাড়ি চলে এর গতিও তত। এই ঘোড়ায় চড়ে কল টিপলেই ঘোড়া আপনাকে এক বছরের পথ এক দিনেই নিয়ে যাবে। যেখানে ইচ্ছা যখন খুশী, যত দূর খুশী যেতে পারবেন।” পারস্যের পণ্ডিত বলল।

বাদশাহ খুব খুশী হয়ে বললেন, “তোমরা তিনজনে আমার এখানে দু একদিন থাক। যা ইচ্ছে তাই খাও। যেখানে খুশী বেড়াও। এই পুতুল, মুরগী আর ঘোড়ার খেলা দেখাও। বকশিশ নিয়ে যাও।”

তিন জনে এক সাথে রাজী হয়ে গেল। তারপর বাদশাহের হুকুম হল খেলা দেখানোর। ভারতবর্ষের শিল্পী তার সোনার মূর্তির ভেরী বাজিয়ে শোনাল। বাদশাহ তা দেখে আর শুনে আনন্দ পেলেন।

তারপর রোমের পণ্ডিত তার রুপোর পাত্রে বসানো মুরগী আর তার বাচ্চা বাদশাহের সামনে রেখে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের ডাক আর পাখা ঝাপটানো দেখাল। মুরগীর ডাক আর তাদের খেলা দেখে বাদশাহ খুশী হলেন।
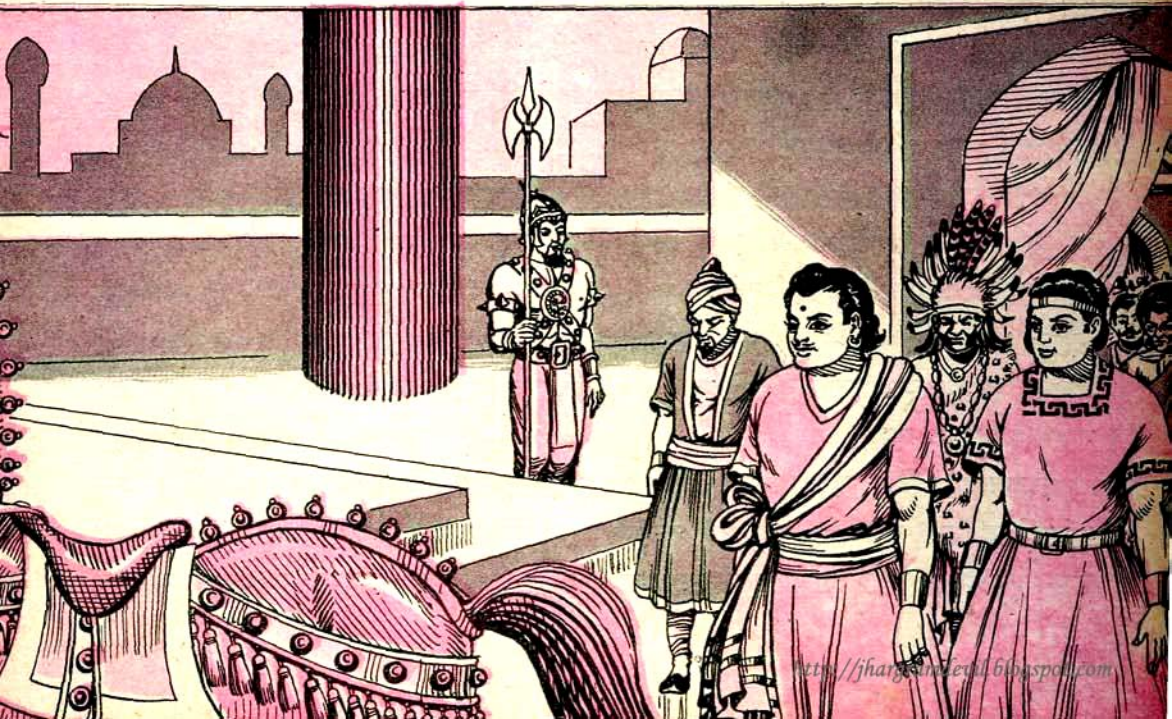
ভারতবর্ষের শিল্পী তার সোনার মানুষের মূর্তি দিয়ে ভেরী বাজালো, রোমের পণ্ডিত তার মুরগীকে দিয়ে তার বাচ্চাগুলোকে ঠোকরানো আর পাখা ঝাপটানো দেখাল। বাদশাহ এবার পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, "ঐ যে দূরে তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের গায়ে, ঐ তালগাছের একটা পাতা নিয়ে এস তো, তখন বুঝব তোমার ঘোড়ার দৌড়।"

মুহূর্তে পারস্যের শিল্পী তাই করল। বাদশাহের সামনে একটা তালপাতা এনে রেখে দিল। তারপর বাদশাহ নিজেও ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

বাদশাহ খুব খুশী হয়ে ওদের বললেন, "বল, তোমরা কে কি চাও।"

তিনজনে সবিনয়ে বলল, "হুজুর, শুনেছি, আপনার তিনটি কন্যা আছে। আমাদের তিনজনের সাথে আপনার ঐ তিন কন্যার বিয়ে দিলে আমরা দারুণ খুশী হব। আপনি কি আমাদের খুশী করার প্রতি-শ্রুতি রাখবেন?"

বাদশাহের কিছু বলার ছিল না। কথা দিয়েছেন। কথা রাখা তাঁর কর্তব্য। বললেন, "ঠিক আছে তাই হবে।" কাজীকে ও সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন বাদশাহ। বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

যা কিছু রাজদরবারে হচ্ছিল বাদশাহের তিন মেয়ে পর্দার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তৃতীয় কন্যার ঘাড়ে তো পড়বে পারস্যের শিল্পী। তার বয়স একশো বছরের

কম হবে না। তাকে দেখেই ভয়ে রাজ-কন্যার বুক কেঁপে উঠল। ছোট রাজকন্যা ভিতরের ঘরে ছুটে গিয়ে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল। তিন মেয়ের মধ্যে সেই ছিল সুন্দরী। আর তার কপালে পড়ল কিনা এক বুড়ো। যেমন বুড়ো তেমনি তার কদাকার চেহারা।

ছোট রাজকন্যা যখন কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিল তখন বাদশাহ সাবুরের ছেলে কামর-অল-আকমর শিকার করে ফিরল। বোনের কাঁদার কথা শুনে সোজা তার ঘরে ঢুকে বোনকে জিজ্ঞেস করল, "বোন, কি হয়েছে বলতো? সব খোলাখুলি বল? ওভাবে কাঁদছ কেন?"

"দাদা, বাবা এক বুড়ো জাদুকরের পাল্লায় পড়ে আমার সাথে তার বিয়ে দিতে চাইছেন। ঐ কদাকার বুড়োকে বিয়ে করার চেয়ে মরা ভাল। আমি মরে যাব। আমি বনে চলে যাব। আমি পাগল হয়ে যাব।"

কামর-অল-আকমর বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, কি হয়েছে আপনার? আর লোক পেলেন না, এক বুড়ো জাদুকরের সাথে আমার ছোট বোনের বিয়ে দিতে চান? ঐ জাদুকরের হাতে বোনকে সঁপে দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চান? জাদুকর আপনাকে কি এমন জিনিস দিয়েছে যে আপনার মাথা খারাপ

হয়ে গেছে? বাবা, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না বলে দিচ্ছি।"

কামর-অল-আকমর বাদশাহকে যখন একথা বলছিল তখন পারস্যের ঐ পণ্ডিত কাছেই ছিল। সে কামরের উপর ভীষণ রেগে গিয়ে মনে মনে কি যেন প্রতিজ্ঞা করল।

বাদশাহ ছেলের কথা শুনে বললেন, "তুমি অত চটছ কেন? আগে ঐ কাঠের ঘোড়াটাকে দেখ। তারপর জিনিসটার বিচার কর। যে ঐ ঘোড়া বানিয়েছে সে যে কত বড় গুণী তার বিচার নিজেই করতে পারবে। দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ওরে কে আছিস, নিয়ে আয় ঐ কাঠের ঘোড়া।"

বাদশাহের অনুচররা কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল। কামর ঘোড়াটাকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কামর এমনিতেই ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে। "বা! চমৎকার ঘোড়াতো" বলে সে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসল। রেকাবে পা ঢুকিয়ে, রেকাব সমেত পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে ঠোক্কর মারতে লাগল। কিন্তু কাঠের ঘোড়া নড়েনা চড়েনা।

তখন বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে বললেন, "ওহে পণ্ডিত, দেখিয়ে দাও কেমন করে চালাতে হয়। ছেলে যে ঘোড়ায় চড়েই পাগল হয়ে গেছে।"

বুড়ো মনে মনে আগে থেকেই চটে ছিল। সে কামরের কাছে গিয়ে বলল, "জীনের ডান দিকের এই বোতাম টিপলেই ঘোড়াটা উপরে উঠে যাবে।"

পার্শী পণ্ডিতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ ঘোড়াটা আকাশে উঠে গেল। চোখের পলকে কামর সকলের নাগালের বাইরে চলে গেল। অনেক ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু কামরের কোন পাত্তা নেই।

বাদশাহ পারস্যের পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, ছেলে এখনও নাবছেনা কেন?"

এতে বুড়ো বলল, "হুজুর আপনার ছেলের ফেরা অত সহজ হবে না। বাঁ দিকের বোতাম টিপলে যে নাবতে পারবে তা বলার আগেই আপনার ছেলে উঠে গেল আকাশে। আপনি জানেন যে কোন বিষয়ে অর্দ্ধেক জ্ঞান মানেই অনর্থ।"

এ কথা শুনে বাদশাহের ভীষণ রাগ হল। তিনি বললেন, "এই কে আছিস, এই বুড়োটাকে আচ্ছা করে চাবুক কষে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখ।"

তারপর তিনি অনুতাপে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শোকে ডুবে রইলেন।

(আরও আছে)

লোভ

প্রাচীনকালে রামশর্মা নামে এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন। নিজের গরিব অবস্থা ফেরানোর জন্য ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন।

অনেক দিনের তপস্যার পর ব্রহ্মা দর্শন দেন। "হে ভগবান, লোকে বলে আপনি নাকি ভক্তদের ভীষণ ভালবাসেন। ভক্তেরা ডাকলেই আসেন। আর আমার বেলায় এত দেরিতে দর্শন দিলেন কেন?" রামশর্মা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"বৎস, আমার সময়ের হিসেব অন্য ধরণের। তোমাদের হিসেবে যা এক যুগ আমার কাছে তা এক দিন। আমি তো তোমার ডাক শোনার ক্ষণিকের মধ্যেই এসে গেছি।" ব্রহ্মা জবাবে বললেন।

রামশর্মা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "ভগবান, আমার কাছে যা এক কোটি টাকা আপনার কাছে তা কত টাকা হয়?"

"এক পয়সার সমান।" ব্রহ্মা বললেন।

"তাহলে, ভগবান, আপনি আমাকে আপনার এক পয়সা পাইয়ে দিন না।" রামশর্মা বললেন।

"কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।" বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন।

টান

এক গ্রামে শিবরাম নামে এক কিষাণ ছিল। তার কিছু জমি জায়গা ছিল। আর ছিল তিনটি ছেলে। তিন জনই বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করত।

ছেলেরা বড় হলে শিবরাম তাদের বিয়ে দিয়ে চাষ আবাদের সমস্ত ভার তাদের হাতে সঁপে দিল।

বৌমাদের বাড়িতে আনার সাথে সাথে শিবরামের জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই এক বউ তার মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিত। মুখ ধোয়ার সাথে সাথে অন্য বউ তার জন্য জলযোগের খাবার নিয়ে হাজির হত। জলযোগের পরে তৃতীয় বউ বড় পিঁড়ি আঙ্গিনায় নিয়ে হাজির হত।

বউরা শিবরামের সব রকমের সুব্যবস্থা করে দিত। ছেলেরা চাষ আবাদ করে যা রোজগার করত তাই এনে দিত বাপের হাতে।

শিবরাম ভাবত তার মত সুখী জগতে আর কোন বাপ নয়। সামনে দিয়ে কেউ গেলে তাকে কাছে ডাকত, পাশে বসাত। আর সে যে কত ভাল আছে তাই জানাত।

অন্যান্য দিনের মত সে দিনও রামনাথকে সে তার সুখে আনন্দে থাকার কথা জানাল। বউ এবং ছেলেরা যে তাকে কত ভাল রেখেছে তাও জানাল। সব শুনে রামনাথ বলল, "একটা কাজ করলে তুমি আরও সুখী হবে, আরও আনন্দে দিন কাটাতে পারবে। তোমার সমস্ত জমি জায়গা তিন ছেলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দাও। তাহলে মরেও শান্তি পাবে। তা না হলে তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে ছেলেরা লাঠালাঠি করবে।" এ কথা বলে রামনাথ চলে গেল।

পুলক দাস

শিবরাম বন্ধু রামনাথের কথা রাত্রে ভেবে বিচার করে ঠিক করল ভাগ করে ছেলেদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। পরের দিনই ছেলেদের ঐ সমস্ত জমি সমান ভাগে ভাগ করে দিল।

এই ঘটনার পরের দিন থেকেই শিবরামের জীবন আর এক মোড় নিল। তার সেবা করা বন্ধ করে দিল। তার কখন কি দরকার তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। চাষ আবাদ করে কে যে কত রোজগার করছে তা বাপের হাতে দেওয়া তো দূরের কথা তাকে জানায়ও না।

শিবরামের কাছে নিজের জীবন ভার মনে হল। আঙ্গিনায় মাথা গুঁজে বসে থাকত। সামনে দিয়ে যারা যাতায়াত করত তাদের ডেকে নিজের দুঃখের কথা জানাত। শিবরামের অন্য বন্ধু পবিত্র একদিন সমস্ত ঘটনা শুনে বলল, "তোমার বিষয় সম্পত্তির জন্যই ছেলে আর বউমারা তোমাকে ভালভাবে দেখত। সম্পত্তি ভাগ করার পর তোমার কাছে তাদের আর কোন প্রয়োজন রইল না। আবার যদি সুখী হতে চাও তো একটি মাত্র পথই খোলা আছে তোমার সামনে। আমি তোমাকে একটা টিনের বাক্সে করে একশো টাকার খুচরো দেব। রাত্রে তুমি তোমার ঘরের খিল এঁটে ঐ খুচরো সব মেঝেতে ফেলে একটা একটা মুদ্রা সশব্দে টিনের বাক্সে উঁচু থেকে ফেলবে। ফেলবে আর

আস্তে করে তুলবে। এই ভাবে এক ঘণ্টা ধরে গুনবে। তারপর দেখবে কি হয়।"

সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন শিবরামের বউমারা অনেক ক্ষণ ধরে টাকা পয়সা গোনার শব্দ শুনতে পেত। প্রথম প্রথম বউগুলো অবাক হত। পরে শ্বশুর মশাইয়ের উপর তাদের টান যেন দিনকে দিন হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল। তার প্রতি বউ-দের ব্যবহার আগের মতই হয়ে গেল। ছেলেরাও চাষ বাসের ব্যাপারে বাপের কাছে সমস্ত জানাতে বসত। শিবরামের দিন কাল ভাল ভাবে কাটছে দেখে তার বন্ধু পবিত্র খুব খুশী হল।

কয়েক বছর পরে শিবরামের অসুখ করল। শিবরাম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। বউরা আর ছেলেরা ঐ টিনের বাক্সে কত টাকা আছে জানার জন্য ছটফট করছে। তখন মৃত্যু-পথ-যাত্রী বন্ধুকে দেখতে গেল পবিত্র। শিবরামের ছেলে আর বউমাদের হাঁকপাকানি দেখে সে ওদের বলল, "আরে তোমরা ঐ টিনের বাক্সের কাছে বসে আছ কেন? আগে শিবরামের কাছে বস। তিনি মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তি করে দশ জনকে ডেকে বাক্সটা খুলবে। যা পাবে তিন জনে ভাগ করে নেবে।"

পবিত্রের কথা শুনল ছেলেরা এবং বউরা। শিবরামের মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা শ্রাদ্ধশান্তি করল। তারপর দশজনকে ডেকে ঐ টিনের বাক্স খুলল। তাতে মাত্র কিছু খুচরো পয়সা ছিল। আর সেই খুচরোর মধ্যে একটি চিরকূটে লেখা ছিল: এই টিনের বাক্স এবং তাতে যে একশো টাকার খুচরো আছে তা আমার বন্ধু পবিত্রকে যেন দেওয়া হয়। এই খুচরো পয়সা সব তার। বাক্সটাও তারই।

চিরকূটের বয়ান পড়ে ছেলেরা আর বউরা তো অবাক। পবিত্র ঐ টিনের বাক্সসহ খুচরো নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

নিরেট বোকা

এক গ্রামে দুজন মূর্খ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ওদের বন্ধুত্ব। একদিন পথে হঠাৎ তাদের দেখা। ওদের একজনের হাতে একটা থলি ছিল।

"আরে এই থলিতে কি আছে?" দ্বিতীয় মূর্খ প্রশ্ন করল। প্রথম মূর্খ নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে দিতে বলল, "এই থলিতে কি আছে তা যদি তুমি বলতে পার তাহলে এতে যতগুলো ডিম আছে সব তোমাকে দিয়ে দেব।"

দ্বিতীয় মূর্খ অনেকক্ষণ ভেবেও কোন জবাব দিতে পারল না।

তারপর প্রথম মূর্খ বলল, "আরে তুমি বলতে পারলে না! আরে বোকা এই থলিতে ডিম আছে। কতগুলো ডিম আছে তা বলতে পারলে এতে যে দশটা ডিম আছে তার সবগুলোই তোমাকে দিয়ে দেব।"

দ্বিতীয় মূর্খ জবাব দিতে পারেনি। এখনও ভাবছে।
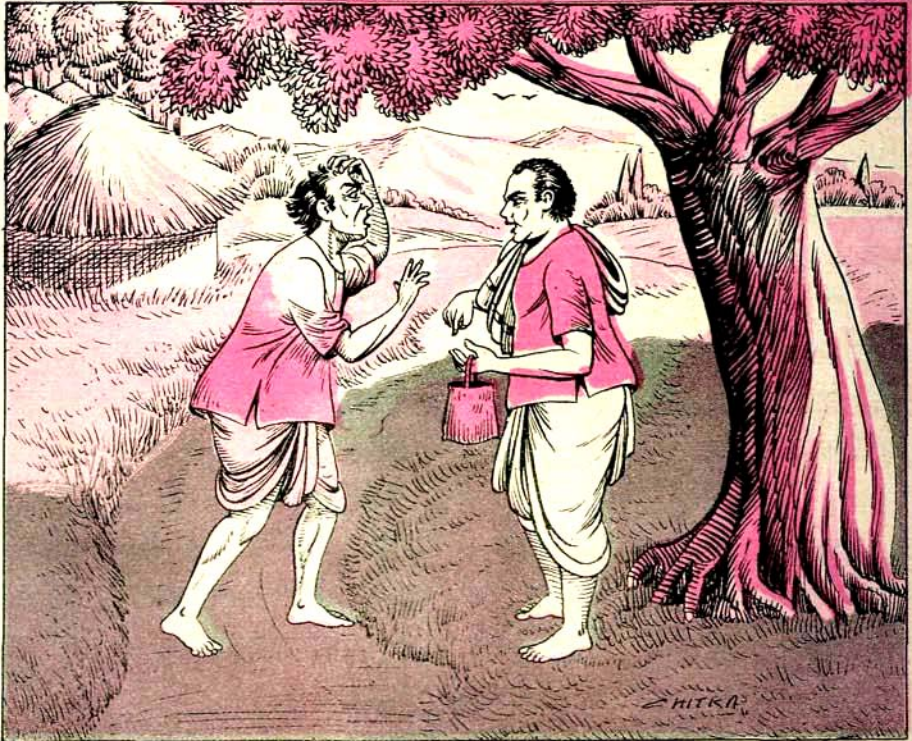
অহংকার

পাণ্ডু রাজার সভায় বিষ্ণুশর্মা নামে এক পণ্ডিত ছিল। রাজা ঐ পণ্ডিতকে বিশেষভাবে খাতির করতেন। ঐ ধরণের পণ্ডিত তাঁর প্রাসাদে থাকার জন্য তিনি অত্যন্ত গর্ব বোধ করতেন। রাজার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেই পণ্ডিত অন্য পণ্ডিতের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে কর আদায় করত। কর দিতে যে রাজী হত না তাকে শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করে বিষ্ণুশর্মাকে হারাতে হত। এই কারণে বিষ্ণুশর্মার নাম ঝগড়ুটে পণ্ডিত নামে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বহু পণ্ডিত ঐ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেল।

ঐ রাজ্যে আর একজন পণ্ডিত ছিলেন। নাম তাঁর মহাভাষ্য ভট্ট। তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। উনিও অন্য পণ্ডিতদের মত যথারীতি কর দিতেন বিষ্ণুশর্মাকে।

মহাভাষ্য ভট্টের এক শিষ্য ছিল। নাম তার যামুনু। শিষ্যটি ছিল খুব চরিত্রবান এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিজের গুরুকে সে দেবতার মত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করত। গুরুর কাছে সে সমস্ত রকমের বিদ্যা অর্জন করেছিল।

মহাভাষ্য ভট্ট দু বছর কর দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে কর আদায় করে আনতে বিষ্ণুশর্মা তার একজন শিষ্য ভঞ্জকে পাঠালেন। ভঞ্জ ছিল অত্যন্ত বদ মেজাজের লোক।

ভঞ্জ মহাভাষ্য ভট্টের বাড়ি গিয়ে দেখে তিনি বাড়ি নেই। কোন কাজে তিনি অন্য গ্রামে গেছেন। মহাভাষ্য ভট্ট সম্পর্কে সে বাজে রসিকতা করে কথা বলল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ভঞ্জর কথা যামুনুর ভাল লাগল না। ভেতরে-ভেতরে তার খুব রাগ হল। গুরুর অপমান যামুনু আর সহ্য না করতে পেরে বলল, "আমার গুরুর কাছ থেকে তোমার গুরুর কর আদায় করার দরকারটা কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি আমার গুরু তোমার গুরুর চেয়ে জ্ঞান কম রাখেন? কোনদিন কি তা প্রমাণ হয়ে গেছে?"

"তাহলে তুমি তোমার গুরুকে গিয়ে বল, যদি সাহস থাকে তো আমার গুরুকে যেন তর্ক করে হারিয়ে দেয়। তাহলে আর কর চাইতে কেউ তাঁর কাছে আসবে না।" ভঞ্জ বলল।

"তোমার গুরুকে হারাতে আমার গুরুকে অত দূর যেতে হবে! চল আমি যাচ্ছি তোমার গুরুর সাথে তর্ক করতে। আর কাউকে কোনদিন কর দিতে হবে না।" বলে যামুনু ভঞ্জের সাথে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাজ দরবারে যামুনুর আসার কারণ অন্য সব পণ্ডিতরা জানতে পেরে মনে মনে ভাবল, হাতী ঘোড়া হল তল, মশা বলে কত জল? ছোকরাটার সাহস তো দেখছি কম নয়।

বিষ্ণুশর্মার প্রতি রাজার টান থাকলেও রাণীর কিন্তু একটুও ছিল না। যামুনুকে দেখে রাণী ভাবলেন, এতো দেখছি একটা আগুনের ফুলকি। খড়ের গাদা যত বড়ই হোক না সেটাকে পুড়িয়ে ছাই করার পক্ষে একটি স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট।

বিষ্ণুশর্মা রাজ দরবারে যামুনুকে বলল, "তুমি তোমার ইচ্ছা মত যে কোন যুক্তি খাড়া কর, আমি তার খণ্ডন করব। আমি খণ্ডন করতে না পারলে তুমি খণ্ডন করবে। তখন তোমার জয় হবে।"

যামুনু হাসতে হাসতে বলল, "আপনার মা বন্ধ্যা নন।"

"একথা ধ্রুব সত্য। এটা খণ্ডন করা যায় না।" ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

"পাণ্ডুরাজা ধর্মাত্মা পুরুষ।" যামুনু বলল।

"এ কথাও ধ্রুব সত্য। এ খণ্ডন করা যায় না।" ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

"মহারাণী পতিব্রতা।" যামুনু বলল।

"এ কথাও ধ্রুব সত্য।" ঝগড়ুটে পণ্ডিত বলল।

"আপনি হেরে গেছেন। আমি যে তিনটি কথা বলেছি সেগুলো আমি খণ্ডন করতে পারি।" যামুনু বলল।

এই কথাগুলো শুনে দরবারের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

"আপনি আপনার মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। মনুসংহিতায় বলেছে, 'এক পুত্রো হ্যপুত্র ইতি লোকবাদাৎ।' তাই আপনি আপনার মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আপনার মা বন্ধ্যা।

"এখন বাকি রইল রাজার ব্যাপার। 'সর্বতো ধর্ম ষড়্‌ভাগো, রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ অধর্মাদপি ষড়্‌ভাগো, ভবত্যস্থহ্য রক্ষতঃ' এটাও মনুসংহিতায় আছে। অর্থাৎ প্রজারা যে পাপ পূণ্য করে তার ছ-ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য হয়। এই কলি যুগে রাজা যত বড়ই ধর্মাত্মা হোক না কেন প্রজারা অধর্মমূলক কাজ অবশ্যই করে থাকে এবং এই অধর্ম কাজের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা পেয়েছেন। অতএব আমাদের রাজা সম্পূর্ণ ধর্মাত্মা হতে পারে না।

"এখন বাকি থাকে রাণীর প্রসঙ্গ। মনুসংহিতায় রাজার বিষয়ে আছে, 'সোগ্নির্ভবতি, বায়ুশ্চ, সোর্ক, স্সোম, স্সধর্মরাট, সকুবের, স্সবরুণঃ, সমহেন্দ্রঃ, প্রভাবতঃ' রাজার মধ্যে এই ভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র প্রমুখ আট জনের অস্তিত্ব থাকে। এহেন রাজার স্ত্রী পতিব্রতা হয় কি করে?" যামুনু জিজ্ঞেস করল।

রাজা ও রাজদরবারের প্রত্যেকে যামুনুর অকাট্য যুক্তি শুনে খুশী হল। ঝগড়ুটে পণ্ডিত পরাজিত হয়ে মাথা নীচু করে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে গেল।
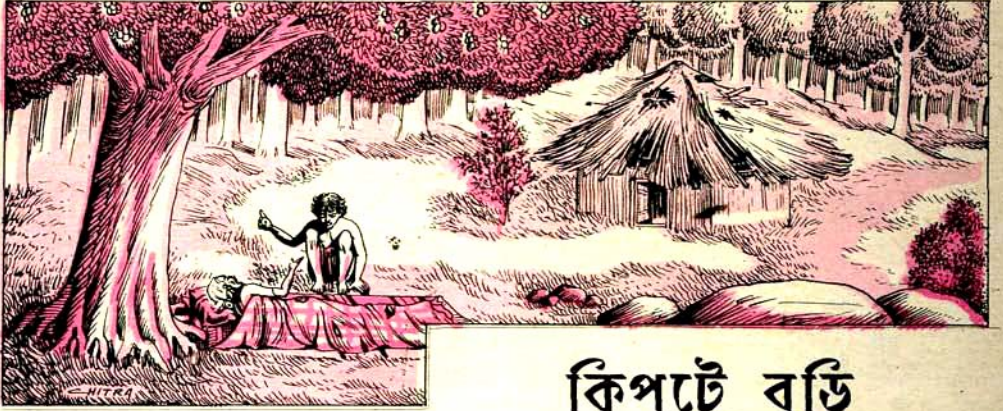
কিপটে বুড়ি

এক গ্রামে এক কিপটে বুড়ি ছিল। তার কিপটেমীর বিষয়ে অনেক ধরণের গল্প প্রচলিত ছিল। তার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা পড়ো পড়ো কুঁড়ে ঘর। একটা বাদাম গাছ আর একটা নিম গাছ। সে কাউকে তার কাছে ঘেঁষতে দিত না।

কেউ তার কাছে নিমপাতা চাইতে এলে এক মুঠো চালের পরিবর্তে এক আঁটি নিম-পাতা দিত। কেউ বাদাম চাইতে এলে এক পয়সার পরিবর্তে একটা বাদাম দিত। রান্না খাওয়ার হাঁড়ি বাসন বলতে ছিল শুধু কয়েকটা মাটির পাত্র। বিছানা বলতে ছিল এক দুর্গন্ধযুক্ত বালিশ। আর ছিল একটি ছেঁড়া কম্বল।

সেই গাঁয়ে কেষ্ট নামে এক ভবঘুরে বেকার ছেলে ছিল। বুড়ির কাছে থাকলে ভালই হবে। বুড়ি বেশি দিন তো বাঁচবে না। সে মরে গেলে তার সমস্ত সম্পত্তির সেই হবে মালিক।

একদিন কেষ্ট বুড়ির কুঁড়ে ঘরে গেল। বুড়ি তখন বাদাম গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে কাঠ বিড়ালি পাহারা দিচ্ছিল।

"দিদিমা, গাছের বাদাম খেতে কেমন লাগে?" কেষ্ট বলল।

বুড়ি কেষ্টর দিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "বাবা, বাদাম যে খেতে কেমন তাতো আমি কোন দিন দেখিনি। তুমি এক পয়সা দিয়ে খেয়ে দেখে আমাকে বলত কেমন লাগে।"

এ কথা শুনে হেসে উঠে কেষ্ট বলল, "দিদিমা, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমাকে তোমার ঘরে রেখে দাও না কেন।" কেষ্ট বলল।

অনুরাধা দেবী

বুড়ি কেষ্টকে খাওয়াত বটে তবে সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটাত। বাদাম এবং নিমের আঁটি গুনে দিত। বাজারে বিক্রি করতে বলত। এক পয়সাও এদিক ওদিক হলে বকুনি দিত। এত কষ্ট সহ্য করেও কেষ্ট বুড়ির কাছে পড়ে থাকত।

কয়েকদিন পরে বুড়ি একেবারে দুর্বল হয়ে গেল। বুঝতে পারল যে তার মরার দিন এগিয়ে এসেছে। বুড়ি ভাবল মারা গেলে তো কুঁড়ে ঘরটা অন্যের হাতে চলে যাবে। তাই সে এক বেনের কাছে কুঁড়ে ঘরটাকে বাঁধা রেখে টাকা নিয়ে নিল।
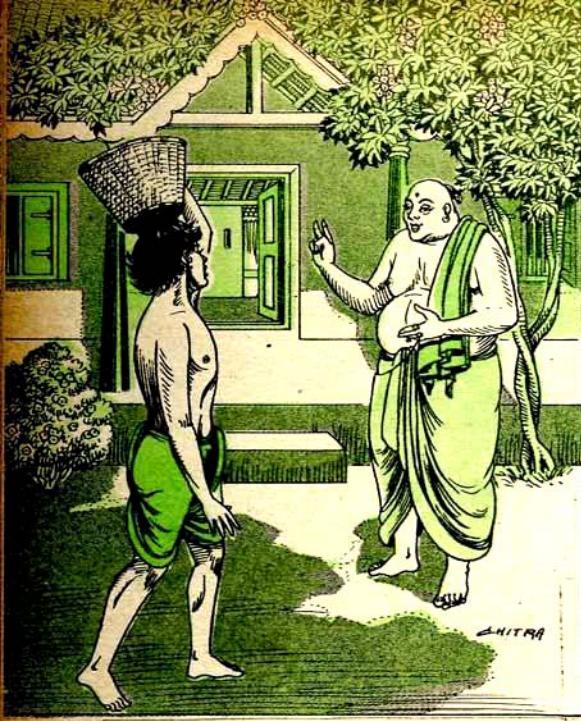
"তুমি কি কাজে আসবে আমার? তোমাকে যা খেতে দেব তাই আমার অপচয়।" বুড়ি জবাবে বলল।

"কাজে আসব না কে বলল? দুদিন আমাকে তোমার কাছে রেখেই দেখ না। যদি মনে কর আমাকে রাখার দরকার নেই। তাহলে রেখো না। তোমার বাদাম আর নিম আমি বাজারে বিক্রি করব। তোমার রোজগার দুপয়সা বেশি হবে।" কেষ্ট বলল।

বুড়ি একটু ভেবে বলল, "ভাল কথা। এখন কাঠ-বিড়ালি পাহারায় লেগে যাও। তোমার কাজে খুশী হলে আমি তোমাকে রাখব।" একথা বলে বুড়ি কম্বল আর বালিশ নিয়ে ঢুকে গেল কুঁড়ের ভিতর।

বুড়ি মারা যাবার পর বেনেটা কেষ্টকে ডেকে বলল, "হ্যারে কেষ্ট, তোর দিদিমা তো কুঁড়ে ঘরটাকে দুশো টাকায় বাঁধা রেখে গেছে। ঐ ঘরে তোর ভাগ আছে না কি?" হাসতে হাসতে বেনে বলল।

কেষ্ট কোন কথা না বলে কুঁড়ে ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, এতগুলো টাকা বুড়ি রাখল কোথায়!

প্রত্যেক দিন বুড়ি ঘুমাতো ঐ কুঁড়ে ঘরে আর কেষ্ট ঘুমাতো বাদাম গাছের নিচে। একদিন রাত্রে শব্দ পেয়ে কেষ্ট ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভিতর তাকাল। দেখতে পেল প্রদীপের আলোতে বুড়ি টাকা পয়সা গুনছে। বুড়ি যতই গোণ, তোমার মারা যাবার পর এইসব টাকা

আমার হাতেই পড়বে। মনে মনে কেষ্ট ভাবল। ফিরে এল গাছের নিচে।

এক দিন বুড়ি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। শ্বাস প্রশ্বাসও তার চলছে না ভাল ভাবে। বুড়ি ভাবল সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। সে কেষ্টকে ডেকে বলল, "বাবা কেষ্ট, আমি আর বাঁচব না। মরে গেলে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে কিছু লোক তো লাগবেই। তারা কিছু খরচও করতে বলবে। তুমি বরং এখনই আমাকে শ্মশানে নিয়ে যাও। আমি ওখানেই মরব।"

কেষ্ট রেগে গিয়ে বলল, "শ্মশানে মরে গেলে কি খরচ লাগবে না। কাঠ তো চাই, মানুষ ছাড়া আমি একা পোড়াতে পারব কি করে!"

"ওরে কেষ্ট তুমি আমার দেহটাকে কেন মিছামিছি পোড়াতে চাইছো। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। গর্ত খুঁড়ে আমাকে কবর দিলেই তো পার। অন্যদের বলবে কেন, তুমি নিজেই এখনই গর্ত খুঁড়ে রাখ। প্রাণ বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে গর্তে ফেলে দেবে। ব্যাস কোন খরচ নেই, ঝামেলা নেই।" বুড়ি যেন একটা নতুন উপায় বলল।

কেষ্ট ভাবল বুড়ির যা কিছু বাঁচবে তা তো তারই হবে। তারপর বুড়ি কম্বল আর বালিশ বগল দাবা করে কবর খানায় পৌঁছাল। কবর খানায় তখন কেউ ছিল
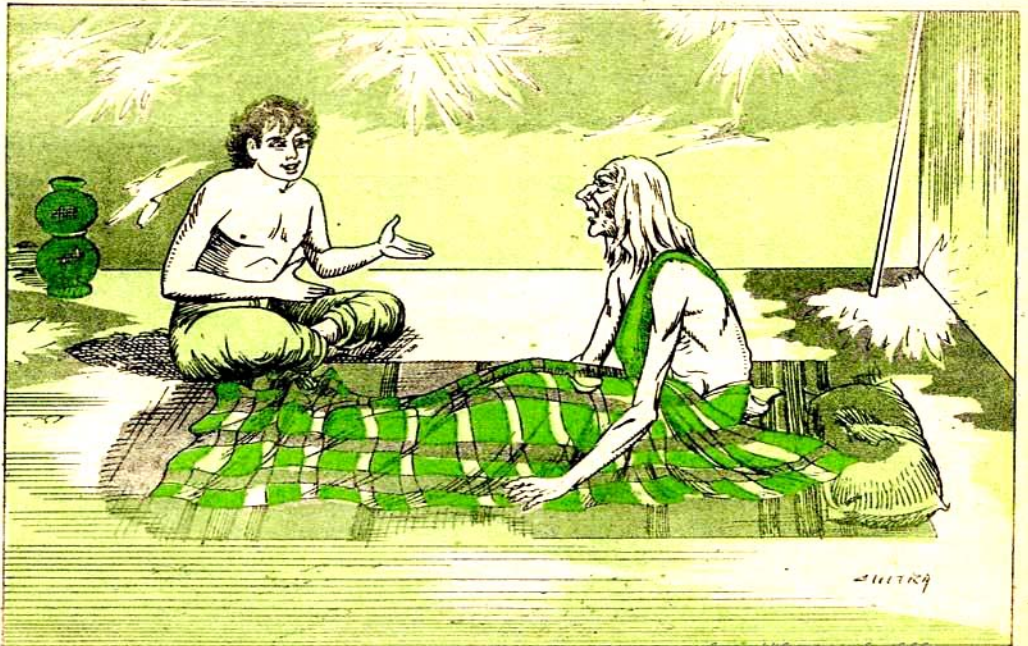
না। একটা তেঁতুল গাছের নিচে বুড়ি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

কেষ্ট গর্ত খুঁড়তে লাগল। বুড়ি জিজ্ঞেস করল, "বাবা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছ?"

"গর্ত খোঁড়া শেষ হলে তোমাকে জানাব।" কেষ্ট বলল।

কেষ্টর গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে ভোর হয়ে এল।

"দিদিমা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছি।" কেষ্ট বলল।

বুড়ি কথা বলল না। কেষ্ট ভাবল বুড়ি অক্কা পেয়েছে। এখন বুড়ির যা কিছু আছে সব আমার। মনে মনে কেষ্ট খুব খুশী। একটা লাঠি দিয়ে বুড়ির নোংরা কম্বল আর বালিশ ফেলে দিল গর্তে। তারপর বুড়িকেও ঐ গর্তে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে কুঁড়ে ঘরের দিকে ফিরে এল।

কুঁড়ে ঘরে ঢুকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে এক কাণা কড়িও পায় নি। মেঝেতে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখল। কোথাও এক পয়সা নেই। চালাটাকে নাবিয়ে নাবিয়ে খুঁজল সেখানেও নেই কাণা কড়ি। কেষ্ট ভাবল যেদিন বুড়ি ঘরটাকে বাঁধা রেখে দিল সেই দিনই টাকাটা খুঁজলে পেয়ে যেত। মনকে বোঝাতে লাগল, বুড়ির কাছে হয়ত আগের জন্মের ঋণ ছিল তাই সে শোধ করে দিল।

কেষ্টর মনে একবারও জাগল না যে সে নিজের হাতে করে বুড়ির সমস্ত টাকা পয়সা গর্তে ফেলে দিয়েছে। সে বুঝতে পারল না বুড়ি যে নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত বালিশটা কাছ ছাড়া করত না সেই বালিশেই সব টাকা ছিল। বুড়ি নিজের সাথেই বালিশ নিয়ে কবরে গেছে।

সকাল হয়ে গেল। কুঁড়ে ঘরটা ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। এবার বেনেটা এসে তাকে শাস্তি দেবে ভেবে কেষ্ট পা চালিয়ে ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।
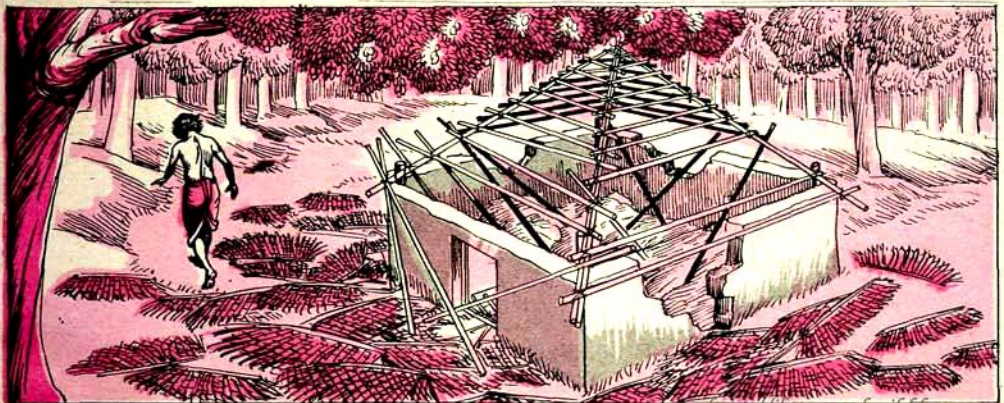
যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে বললেন, " ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনি পুত্রের অনুগত হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে চাইছেন এতে আপনার পৃথিবীব্যাপী নিন্দা হয়েছে। আপনার দোষেই কুরু-পাণ্ডবের বিরোধ ঘটেছে। যুধিষ্ঠিরকে যদি রাজ্য ফিরিয়ে না দেন তবে অগ্নি যেমন শুকনো তৃণ দগ্ধ করে সেই রকম অর্জুনও কৌরব-গণকে ধ্বংস করবেন। যুধিষ্ঠির যা বলেছেন কাল সকালে আপনাকে জানাব।"

সঞ্জয় চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে বললেন, "পাণ্ডবদের কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে তিরস্কার করেছে। যুধিষ্ঠির যা বলেছে তা কাল আমাকে জানাবে। আমি ভীষণ উৎকণ্ঠায় আছি। বিদুর, তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দাও।"

বিদুর বললেন, "মহারাজ, যুধিষ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুক্ত তিনলোকের অধিপতি হবার যোগ্য। তিনি আপনার বাধ্য ছিলেন তাই নির্বাসনে গিয়েছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য রাজ্যলাভের যোগ্য নন। আপনি পাণ্ডবগণকে তাঁদের পিতৃরাজ্য দান করুন। তাতে আপনি পুত্রদের নিয়ে শান্তিতে থাকবেন, সুখী হবেন। আর আপনার অপবাদ দূর হবে। যতকাল মানুষের কীর্তি প্রচার হয় তত কালই সে স্বর্গসুখ ভোগ করে। আপনি

পাণ্ডু পুত্রদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন তাতে আপনি ইহলোকে যশ এবং মরণান্তে স্বর্গলাভ করবেন।" একটি প্রাচীন উপাখ্যান শুনিয়ে বিদুর বললেন, "মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা বলে আপনি পুত্র ও অমাত্য সহ বিনষ্ট হবেন না। পাণ্ডবদের সাথে সন্ধি করুন। পাণ্ডবরা যেমন সত্য পালন করেছেন দুর্যোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করুন। তিনি পূর্বে যে পাপ করেছেন আপনি তার অপনয়ন করুন।" বিদুর আরও অনেক উপদেশ দিলেন।
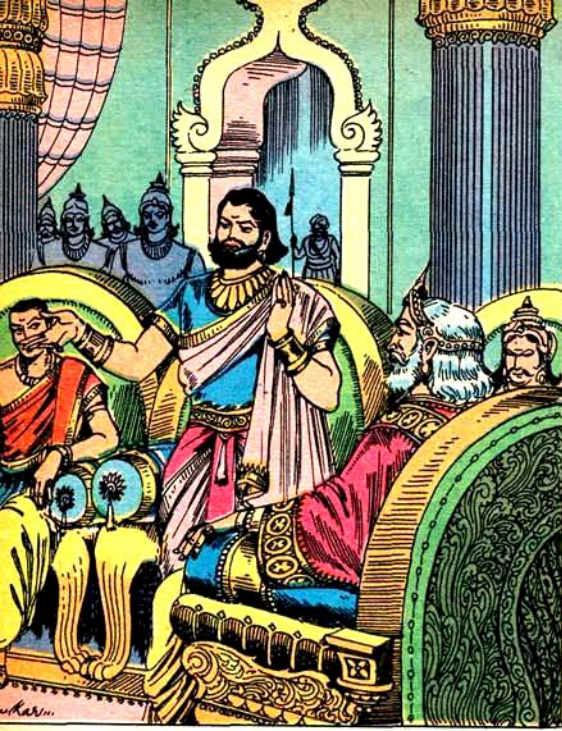
ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "তুমি যা বলেছ সবই সত্য, পাণ্ডবদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার মনের পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকার নিরর্থক।

"তোমার কথা অতি বিচিত্র, যদি আরও কিছু বলবার থাকে তো বল।"

বিদুর বললেন, "আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি, অধিক কিছু বলতে সাহস করিনা।"

পরের দিন ধৃতরাষ্ট্রর সভায় সভাসদরা ভরে ছিল। সভা গম গম করছিল। যুদ্ধে দুর্যোধনকে সাহায্য করতে যে সব রাজারা এসেছিল, তারা সবাই সঞ্জয়ের কাছ থেকে খবর শোনার জন্য ভীষণ কৌতূহলী ছিল। সবাই গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় সভা ভবনে সঞ্জয় প্রবেশ করে সবাইকে প্রণাম করে বললেন, "হে রাজগণ, আমি পাণ্ডবদের কাছ থেকে ঘুরে এসেছি। ওঁরা আপনাদের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ওঁরা কুশলেই আছেন। আমি ওঁদের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য শোনালাম।"

ধৃতরাষ্ট্র হঠাৎ বলে উঠলেন, "সঞ্জয়, তুমি যে পাণ্ডবদের আমার কথা শোনালে তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমি অন্যেরা কি বলেছে পরে জেনে নেব, আগে বল অর্জুন কি বলেছেন।"

এ কথায় সঞ্জয় বললেন, "সবার সামনে পেশ করার জন্য অর্জুন বললেন, দুর্যোধন প্রমুখেরা অনেক পাপ করেছেন। তাঁরা

যুদ্ধ চাইলে তাঁদের পাপের ফল ভোগ করতে হবে। যুধিষ্ঠির এখনও নিজের ক্রোধ সংযত করে রেখেছেন। তাঁর ক্রোধ প্রকাশ পেলে কৌরবেরা ভস্মীভূত হবেন। এক ভীম গদা হাতে কৌরব সেনাদের শেষ করে ফেলবে। তখন দুর্যোধনের দুঃখের সীমা থাকবে না। নকুল, সহদেব, বিরাট রাজা দ্রুপদ, উজপাণ্ডব, অভিমন্যু সহ আমি যখন কৌরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তখন দুর্যোধনের অনুশোচনার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমি সমস্ত বয়ঃ জ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আমার রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করব। যতদিন পাণ্ডবেরা বেঁচে থাকবে ততদিন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার রাজ্য সুখে ভোগ করবে কি করে। আর যুদ্ধে যদি আমরা পরাজিত হই তো ভাবব এই জগতে ধর্ম বলে আর কিছু রইল না। কিন্তু তা কখনই হতে পারে না। কর্ণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যেক পুত্রকে আমি একাই বধ করব। তাই আপনারাই ঠিক করুন কি করবেন।"

ভীষ্ম বললেন, "আমি শুনেছি দেব-গণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁরা সুরাসুরেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যদি আমার কথায় কান না দাও তবে বহু

লোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিন জনের মতে চলেছ। নীচু জাতীর সূতপুত্র কর্ণ যাঁকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সুবলপুত্র শকুনি এবং ক্ষুদ্রাশয় পাপবুদ্ধি দুঃশাসন। এঁরাই তোমার উপদেষ্টা।"

কর্ণ বললেন, "পিতামহ, আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করি। ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হইনি। আমার কি অপকর্ম দেখেছেন যে নিন্দা করছেন? আমি সকল পাণ্ডবকে যুদ্ধে বধ করব। যাদের সাথে পূর্বে বিরোধ বেধেছে তাদের সাথে আর সন্ধি হতে পারে না।"

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "এই দুর্মতি সূতপুত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পুত্রেরা বিপদে পড়বে। বিরাট নগরে এঁর ভ্রাতা

অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছিলেন, তখন কর্ণ কি করছিলেন? কৌরবগণকে পরাজিত করে অর্জুন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করছেন।"

মহামতি দ্রোণ বললেন, "মহারাজ, ভীষ্ম যা বলবেন আপনি তাই করুন। অহঙ্কারী লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই সন্ধি করা ভাল। কারণ অর্জুনের সমতুল্য ধনুর্ধর তিন লোকে নেই।"
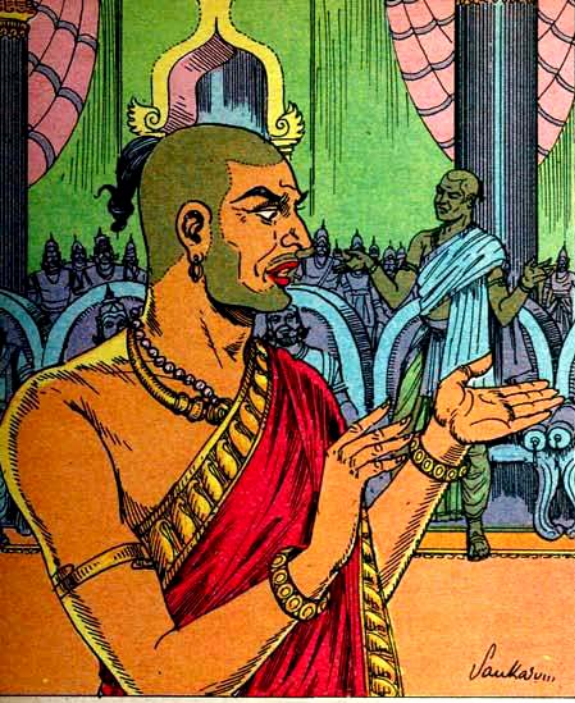
ভীষ্ম ও দ্রোণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র কান দিলেন না। তাঁদের সাথে কথাও বললেন না। শুধু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য একত্র হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির কি বললেন? কারা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কারা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে বলছেন?"

সঞ্জয় বললেন, "যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাঞ্চাল কেকয় ও মৎস্যগণ, গোপাল ও মেষপালকগণ, সকলেই যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ।" সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূর্চ্ছিত হলেন। বিদুরের মুখে সঞ্জয়ের অবস্থা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "পাণ্ডবরা এঁকে উদ্বিগ্ন করেছেন।"

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, "মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের মহাবল ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী যিনি পূর্বজন্মে কাশীরাজের কন্যা ছিলেন এবং ভীষ্মের বককামণায় তপস্যা করে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে পরে পুরুষ হয়েছেন। কেকয়রাজের পঞ্চ-পুত্র, বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকি কাশীরাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কৃষ্ণতুল্য বলবান অভিমন্যু, শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎ-সেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব এঁরাই যুধিষ্ঠিরের সহায়।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "ভীমকে আমি সব চেয়ে ভয় করি। তার কাছে ক্ষমা নেই, শত্রুকে সে ভোলে না, পরিহাসের সময়ও হাসে না, বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায়। উগ্র স্বভাব, বহুভোজী, অস্পষ্টভাষী, পিঙ্গলনয়ন, ভীম গদার আঘাতে আমার পুত্রদের বধ করবে। আমাদের তেমন সারথি নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আমি ভাল মনে করি না। আপনারা ভেবে দেখুন যদি আপনাদের মত হয় তবে আমি শান্তির চেষ্টা করব।"

দুর্যোধন বললেন, "মহারাজ, ভয় পাবেন না। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বের চেয়ে শক্তিহীন হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে। যে রাজারা আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগী হবেন। অতএব আপনি ভয় পাবেন না। আমি এক আঘাতেই ভীমকে যমালয়ে পাঠাব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ এঁরা যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন। এঁরা একত্র হলে ক্ষণকালের মধ্যেই তাদের যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শক্তির অস্ত্র লাভ করেছেন। সেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন কি করে বাঁচবেন? মহারাজ বিপক্ষের শক্তি সব দিক থেকেই আমাদের তুলনায় কম।"
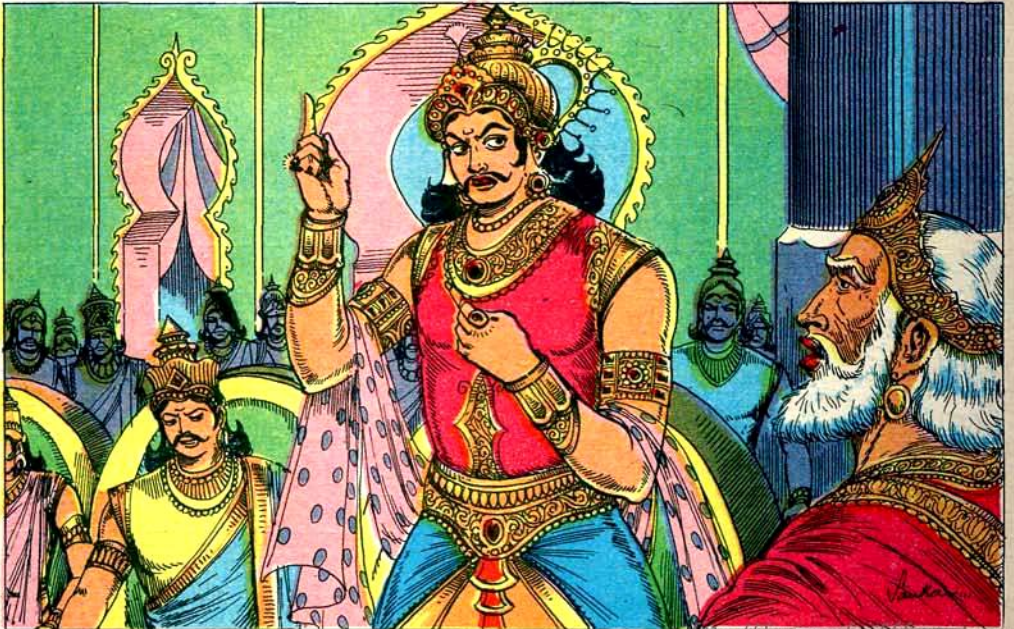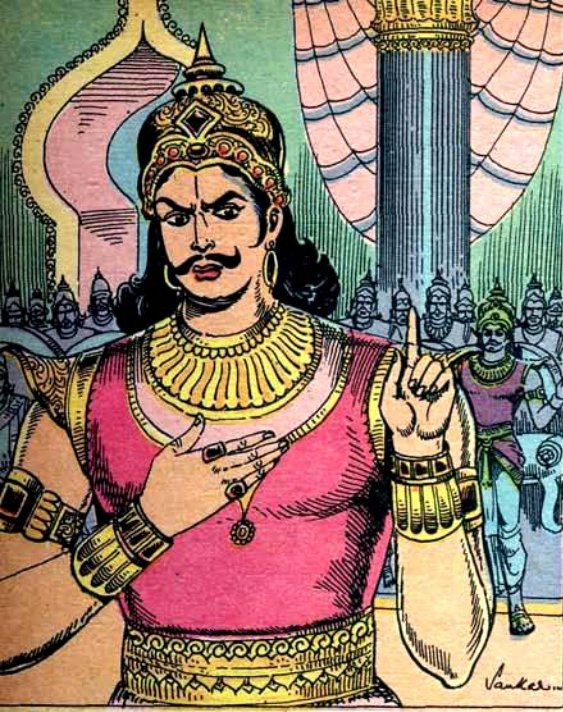
ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "দুর্যোধন, যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও। অর্দ্ধেক রাজ্যই তোমাদের জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট। পাণ্ডবগণকে তাদের প্রাপ্য ভাগ দিয়ে দাও। আমি যুদ্ধের ইচ্ছা করি না। ভীষ্ম দ্রোণাদিও করেন না।"

দুর্যোধন বললেন, "আপনার অথবা ভীষ্ম দ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ করিনি। আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। আমি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব। কিন্তু পাণ্ডবদের সাথে একত্রে বাস করব না। তীক্ষ্ণ সূঁচের অগ্রভাগ দিয়ে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায় তাও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।"

কর্ণ বললেন, "আমি পরশুরামের কাছে যে ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছি তাতেই পাণ্ডবগণকে সংহার করব।"

ভীষ্ম বললেন, "কর্ণ, কৃতান্ত তোমার বুদ্ধি অভিভূত করেছেন তাই গর্ব করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শক্তির অস্ত্র কেশবের সুদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। তোমার অপেক্ষাও পরাক্রান্ত শত্রুকে যিনি সংহার করেছেন, তিনিই অর্জুনকে রক্ষা করবেন।"

কর্ণ বললেন, "মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরূপ, কিংবা আরও বেশি। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আমি অস্ত্র ত্যাগ করলাম। ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এঁর মৃত্যুর পর পৃথিবীর সকল রাজা আমার বিক্রম দেখবেন।" এই বলে কর্ণ সভা থেকে চলে গেলেন।

ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, "কর্ণ সত্য-প্রতিজ্ঞ, কিন্তু কি করে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে? এই নরাধম যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরশুরামের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে।"

ভীষ্মের কথা শুনে দুর্যোধন তাঁর নিন্দা করে বললেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, পাণ্ডবরাও আমাদেরই মত মানুষ। ওরাও আমাদের সাথেই জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদেরও অস্ত্র আছে। আমরাও যুদ্ধ
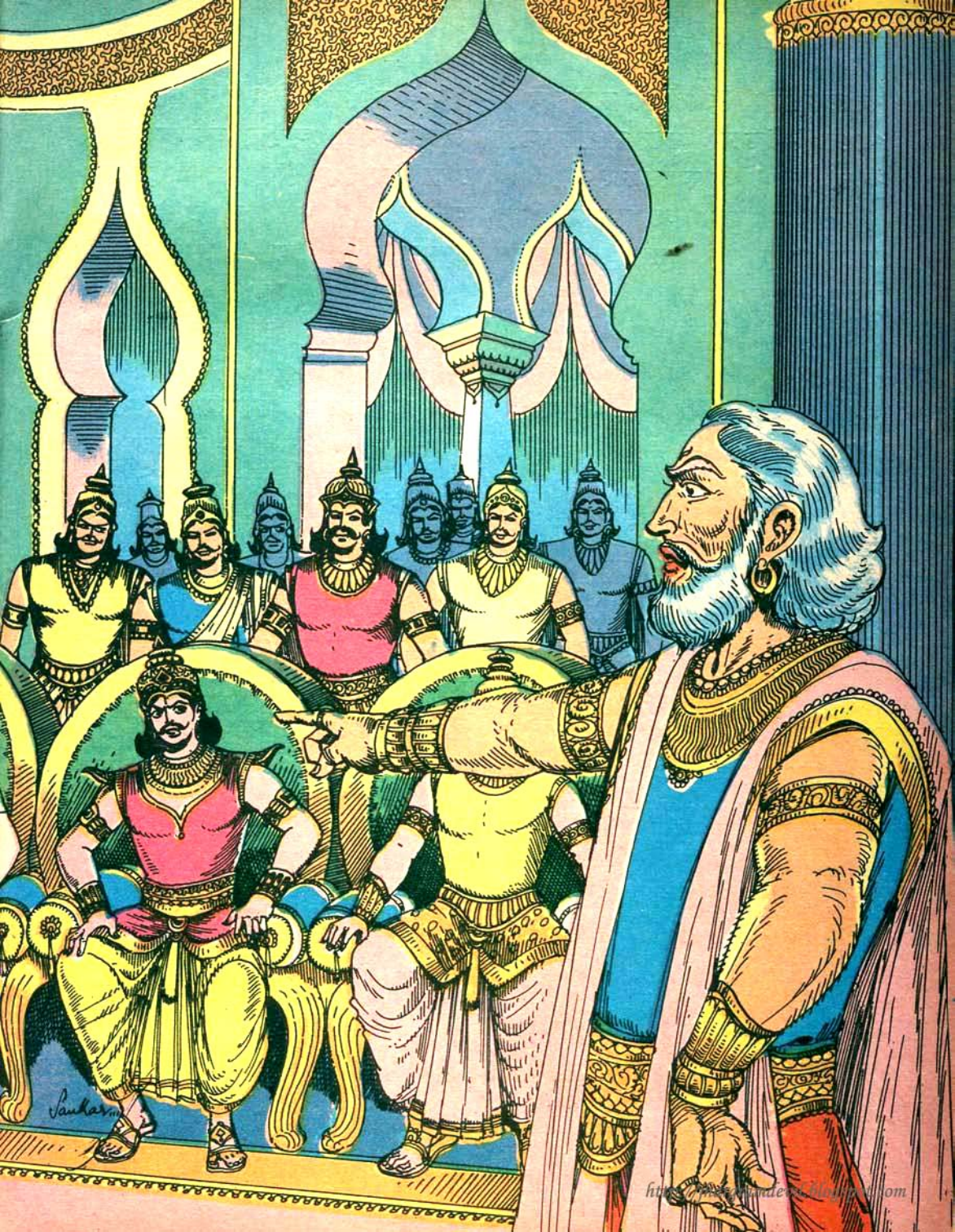
করতে পারি। এখনই কি করে বলি যে পাণ্ডবরাই জিতবে। যুদ্ধের ব্যাপারে আমি কারো উপর নির্ভর করতে চাই না।”

দুর্যোধনের যুদ্ধের ইচ্ছা লক্ষ্য করে বিদুর তাকে এক কাহিনী বললেনঃ এক শিকারীর জালে ধরা পড়ল দুটো পাখি। কিন্তু তারা নির্ভয়ে জাল নিয়ে উড়ে গেল। তাদের অনুসরণ করে শিকারীটাও মাটির উপর ছুটতে লাগল। তা দেখে এক মুনি তাকে বললেন, “ওরে পাগল, যে পাখি আকাশে উড়ছে তাকে ধরার জন্য মাটির উপর ছুটে কি লাভ?” তার জবাবে শিকারী বলেছিল, “মুনিবর, যতক্ষণ না ঐ পাখি দুটো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে ততক্ষণ আমার ছোটা বৃথা, কিন্তু তারা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে তখন আমি ঐ জাল আর পাখি দুইই পেয়ে যাব।” শেষে পাখিগুলো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে নীচে পড়ে গেল। শিকারী পাখি ও জাল নিয়ে বাড়ি গেল।

এই কাহিনী শুনিয়ে বিদুর দুর্যোধনকে বললেন, বাবা, আত্মীয় স্বজনদের সাথে রাজ্য নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা উচিত নয়। আত্মীয়দের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে থাকতে হয়। আমি তোমাকে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার আমরা কিরাতদের সাথে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ভয়ঙ্কর আকারের মধুর চাক ছিল। সেখানকার লোকগুলো বলল ঐ মধু যে পান করবে সে বৃদ্ধ হবে না, তার মৃত্যু হবে না। অন্ধ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে। আমাদের সাথে যে কিরাতরা ছিল তারা মধুর লোভে পড়ে ভয়ঙ্কর সাপে ভরা ঐ অজানা অঞ্চলে নেমে মারা যায়। তারা মধুর লোভে পড়ে তার বিপদের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। রাজ্য পাওয়ার লোভে পাণ্ডবদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ করার ব্যাপারটাও ঐ ধরণেরই বোকামী হবে।
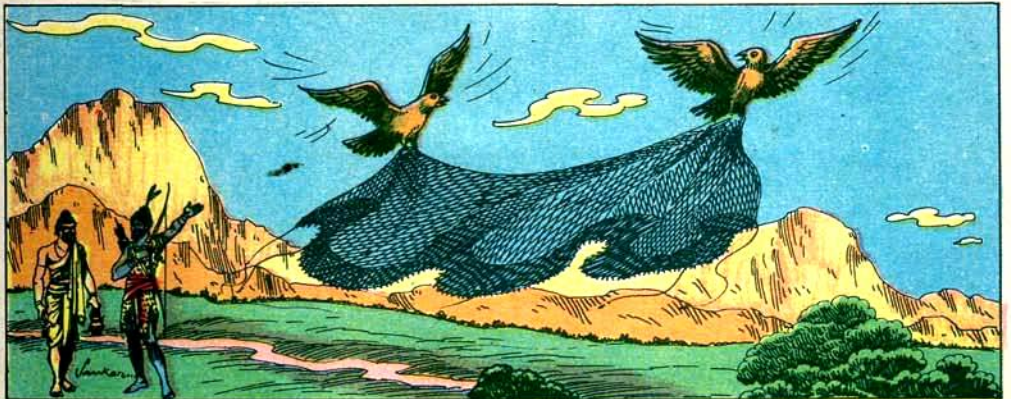
শিবলীলা

[এক]

মহর্ষি মৃকণ্ডু ও তার স্ত্রী মরুদ্বতীর অনেককাল কোন সন্তান ছিল না। তাই তীর্থে ঘুরে তারা তপস্যা করেছিল।

একদিন সেই দম্পতি কেদারেশ্বরের অর্চনা করে ধ্যান মগ্ন ছিল। তখন তারা একটি ধ্বনি শুনতে পেল, "এবার তোমরা নিজের আশ্রয়ে ফিরে যাও। তোমাদের সন্তান হবে।" অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে তারা বাড়ি ফিরে গেল। গৃহীর কর্তব্য পালন করে যেতে লাগল মৃকণ্ডু। কিছুকাল পরে মরুদ্বতীর এক পুত্র হল। তখন তারা আকাশ থেকে শুনতে পেল, "এই শিশুর আয়ু অল্প, মাত্র বার বছর।" এ কথা কানে যেতেই তাদের মন খারাপ হয়ে গেল। পরে তারা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে ভাবল, "সবই শিবের লীলা। আমরা আর কি করতে পারি।" তারা শিশুর হাসি দেখে আনন্দ পেল।

তারপর মৃকণ্ডু নিজের পুত্রের নামকরণ করল মার্কণ্ডেয়। দিনে দিনে বাড়ে মার্কণ্ডেয়। উপনয়নের পর সে গুরুকুলে পড়াশুনা করতে গেল। এগার বছরের মধ্যে সমস্ত বিদ্যালাভ করে বাবা মার কাছে মার্কণ্ডেয় ফিরে এল। ব্রহ্মতেজে মার্কণ্ডেয় দীপ্ত। অপরূপ তার রূপ। তাকে দেখেই মা-বাবা চমকে উঠল। ছেলের আয়ুর আর মাত্র এক বছর বাকি আছে। মরুদ্বতী নিজের পুত্রকে গলায় জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। মার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

কিছুই বলল না। শেষে মৃকণ্ডুই বুকে কান্না চেপে ছেলেকে জানিয়ে দিল তার আয়ু আর মাত্র এক বছর।

এ কথা জেনেই ধীর স্থির ভাবে কিছুক্ষণ ভেবে মার্কণ্ডেয় বলল, "আপনারা দুজনে আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি যেন শিবের অনুগ্রহ লাভ করে চিরজীবী হতে পারি।" মার্কণ্ডেয় বলল বাবা-মাকে প্রণাম করে। তখন মরুদ্বতী ও মৃকণ্ডু দুজনে পুত্রকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করল। "তুমি চিরজীবী হও বাবা।" তখনই সেখানে মহর্ষি নারদ পৌঁছে গেলেন। মৃকণ্ডু প্রণাম করে নারদকে পুত্রের সমস্ত ব্যাপার বলল। মার্কণ্ডেয় যে সঙ্কল্প করেছে তা শুনে নারদ তাকে প্রশংসা করে তাকে আশীর্বাদ করলেন, "বাবা মার্কণ্ডেয়, তুমি সোজা গৌতমীর তটে চলে যাও। সেখানে শিবের অর্চনা কর। তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।"

মার্কণ্ডেয় গৌতমীর তটে গিয়ে সৈকত লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করে বলল, "হে চন্দ্রশেখর, তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ের কাছে থাকলে যম নেবে কি করে।"

তারপর নারদ সমস্ত লোক ঘুরে অবশেষে যমের কাছে পৌঁছে বললেন, "মৃত্যুকে পরাজিত করার অভিলাষে মার্কণ্ডেয় তপস্যা করছে। এখন তোমার ক্ষমতার দৌড় দেখা যাবে।" এ কথা বলে নারদ চলে গেলেন।

মার্কণ্ডেয়র আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। যম মার্কণ্ডেয়র প্রাণ আনতে দূত পাঠাল। কিন্তু যমদূত মার্কণ্ডেয়র কাছে যেতে পারল না। ফিরে এলে যম নিজেই দণ্ড নিয়ে মোষে চড়ে রওনা হয়ে গেল।

মার্কণ্ডেয় শিবলিঙ্গের উপর নিজের মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে ধ্যানমগ্ন রইল। সেই অবস্থায় যম নিজের দণ্ড মার্কণ্ডেয়র গলা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সেই দণ্ড গিয়ে পড়ল শিবলিঙ্গের উপর। তৎক্ষণাৎ ঐ লিঙ্গ থেকে শিব বেরিয়ে এসে প্রলয় রুদ্ররূপ ধারণ করলেন। তৃতীয় নেত্র খুলে যমের দিকে ত্রিশূল নিক্ষেপের লক্ষ্য স্থির করলেন। তখন যম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হর হর! বাঁচাও।" সে পরক্ষণে অজ্ঞান হয়ে গেল।

শিব মার্কণ্ডেয়র মাথায় নিজের অভয় হস্ত রেখে আশীর্বাদ দিতে দিতে বললেন, "হে বৎস! তোমার এখন মৃত্যু হবে না। কল্প-কল্পান্তর পর্যন্ত তুমি চিরজীবী থাকবে।" তারপর সমস্ত দেবতারা শিবের কাছে প্রার্থনা করে বললেন যে যম না থাকলে অনেক রকমের বিপদ দেখা দিতে পারে। যমকে তিনি যেন ক্ষমা করেন। তারপর শিবের অনুগ্রহে যম এমন ভাবে উঠে বসল যেন তার পুনর্জন্ম হয়েছে। তারপর শিবকে প্রণাম করে যম নিজের লোকে ফিরে গেল।

সেই সময় নিজের পুত্রকে দেখতে এল মরুদ্বতী ও মৃকণ্ডু। শিবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত মার্কণ্ডেয়কে দেখে তারা পরমানন্দ লাভ করল। শিবের মহিমাকীর্তন করতে করতে পুত্রকে নিয়ে নিবাসে চলে গেল।

তারপর মার্কণ্ডেয় বহুকাল জীবিত ছিল। তবে, তার চেয়ে বেশি কাল বেঁচে থাকার মত লোকও ছিল।

ইন্দ্রধ্যম্নু নামক রাজা যশ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গিয়েছিল। স্বর্গবাসীরা তাকে বলল, "ভূলোকে তোমার কথা স্মরণ করার মত কেউ নেই। তাই স্বর্গে তোমার কোন স্থান হবে না। অতএব তুমি ভূলোকে চলে যাও।"

ইন্দ্রধ্যম্নু ভূলোকে এসে তার নাম কেউ জানে কিনা খোঁজ করতে করতে মার্কণ্ডেয়র কাছে গেল। "আমি তোমাকে চিনি না। তবে আমার চেয়ে বয়সে বড় প্রাবরকর্ণ (পেঁচা) আছে, তাকে জিজ্ঞেস করতে পার।" মার্কণ্ডেয় বলল। তারপর তারা দুজনে মিলে প্রাবরকর্ণের কাছে গেল।

"আমি তোমাকে চিনি না। তবে আমার চেয়ে বড় নালীকজঙ্ঘু। চল তাকে জিজ্ঞেস করি।" প্রাবরকর্ণ বলল।

নালীকজঙ্ঘু ও ইন্দ্রধ্যম্নুকে চিনতো না। সে তখন ওদের নিয়ে গেল তার চেয়ে বয়সে বড় আকুপার নামক কচ্ছপের কাছে।

আকুপার ইন্দ্রধ্যম্নুকে দেখে বলল, "আমি তোমাকে চিনি। তুমি অনেকবার আমাকে বাঁচিয়েছ। আমি যে সরোবরে আছি সেই সরোবর কেমন ভাবে হয়েছে জান? তুমি অনেক যজ্ঞ করে গরুগুলোকে দান করেছিলে। ঐ গরুদের চলার ফলে এখানে বিরাট গর্ত হয়ে যায়।"

তারপর দেবতারা ভাবল যে ইন্দ্রধ্যম্নুর যশ এখনও ভূলোকে আছে। তাই, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেল।

'আল্বট্রাস' পাখি

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ১২০০ মাইল পূব দিকের দক্ষিণ আটলান্টিকের শীত প্রধান অঞ্চলে দক্ষিণ জর্জিয়ার দ্বীপপুঞ্জে আল্বট্রাস নামক এক ছোট্ট দ্বীপ আছে। সেখানে আল্বট্রাস পাখির বাস। এই পাখিগুলো জলচর। পাখিগুলো অনেক বড় ধরণের। ছড়ালে ঐ পাখির পাখার দৈর্ঘ ১১ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। বাতাস নিশ্চল থাকলে ঐ পাখি উড়তে পারে না, নাবতেও পারে না। বাতাস প্রবল থাকলে এই আল্বট্রাস পাখিগুলো ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতিতে উড়তে পারে। আল্বট্রাস দ্বীপে সব সময় প্রবল বেগে বাতাস বয়ে থাকে। এই চিত্রে আছে এক জোড়া আল্বট্রাস পাখি।

ফটো ঃ অনন্ত দেশাই

পুরস্কৃত
টীকা

কেনা বেচাই জীবন

পুরস্কার পেলেন
জে. কে. মুখার্জী

ফটো : অনন্ত দেশাই

কাঁটা পুকুরের দক্ষিণ দিকে
নবগ্রাম, হুগলী

কাজে দিয়েছি মন

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে মার্চ '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিম্নের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো মে '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

হরিয়ানার লোকনৃত্য

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

ভাঙ্গারা নৃত্যশিল্পী

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

চিক্‌লেট্‌স জোকারওয়ালা ওপরের ছবিতে রঙ লাগিয়ে দেখো—যেমন সোজা তেমনি মজা! এই সঙ্গে তালিকাতে যেসব রঙের নাম লেখা আছে শুধু সেইসব রঙ লাগাবে। যেমন ধর যেখানে P লেখা আছে সেখানে পিংক (গোলাপী) রঙ লাগাবে। ঠিক সেই ভাবে যেখানে R লেখা আছে সেখানে লাগাবে লাল রঙ। রঙ লাগানো শেষ হলেই চটপট রঙ করা ছবিটি আর সেই সঙ্গে ১২টি চিকলেট্‌স-এর একটি খালি প্যাক আর নীচের কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠাবে:

Chiclets Product Officer
CB
Post Box 9116, Bombay 25

কেবল ১৫ বছরের কম বয়েসের ছেলেমেয়েরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

প্রথম ১০০ টি প্রবেশপত্রের (প্রতিটি ভাষায় ১০টি) মধ্যে প্রতিটি প্রবেশপত্রের জন্যে পাওয়া যাবে ৪টি কমিক কিম্বা 'ওয়ার্লড ১০০' ভিন্ন ভিন্ন ডাক টিকিট।

রঙের তালিকা:

P—পিংক (গোলাপী); R—লাল; O—অরেঞ্জ; L.B.—ফিকে নীল; D.B.—গাঢ় নীল; G—সবুজ; V—বেগুনী আর Y—হলদে।

আমার নাম ....

ঠিকানা ....

....

....

আমি চাই ৪টি কমিক্ কিম্বা 'ওয়ার্লড ১০০' ভিন্ন ভিন্ন ডাক টিকিট
(যেটি তোমার চাই তাতে টিক চিহ্ন লাগাও)

চিক্‌লেট্‌স—মজার চুইং গাম ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' আর ক্যালসিয়ামে ভরা

WH. 5654 R

Photo by : RAM KRISHNA SHARMA

CHANDAMAMA (Bengali) MARCH 1973 Regd. No. M. 9100

শিবলীলা